মঙ্গল কাব্যের গল্প

জনশিক্ষা
গ্রন্থমালা
৮

মঙ্গল-কাব্যের গল্প

মহাভারতীয় গল্প, পুরাণের গল্প, জ্ঞান ও কর্মে বাঙগালী
সাহিত্যে বাঙগালী প্রভৃতি "জনশিক্ষা" গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীপরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
প্রণীত

সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড

উপহার

সূচী—

ভূমিকা

রামায়ণ, মহাভারত আর ভাগবত ছাড়াও মধ্যযুগে আমাদের দেশে অনেকগুলি বড় বড় কাব্য লেখা হয়েছিল। তাদের মধ্য থেকেই কতকগুলি প্রসিদ্ধ কাব্যের গল্প এই বইয়ে দেওয়া হলো। এ গল্পের অনেকগুলিই বাঙালীর নিকট কিছু কিছু পরিচিত। এর মধ্যে অনেক দেবতা আছেন, কিন্তু তাঁরা স্বর্গলোকের নহেন, আমাদের মতই যেন মাটির মানুষ। এ গল্পগুলি পড়লে সেকালের জীবনের সঙ্গে সুন্দর পরিচয় ঘটবে। মধ্যযুগের বাঙালীর শিক্ষাদীক্ষা, রুচি-প্রকৃতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের পরিচয় পেতে পারি এই মঙ্গল-কাব্যগুলি থেকেই। তাই এই মঙ্গল-কাব্যগুলি একাধারে বাঙালীর জাতীয় মহাকাব্য এবং ইতিহাসের স্থান অধিকার করেছে।

নৈহাটী

শ্রীপরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

প্রকাশকের নিবেদন

দীর্ঘকাল ধরে আমরা বাংলার শিক্ষা ও সাহিত্যক্ষেত্রে যে নতুন নতুন অভিযান চালিয়ে আসছি, তা'তে যুক্ত হলো একটা নতুনতর প্রচেষ্টা—এই 'জনশিক্ষা গ্রন্থমালা'।

স্বল্পশিক্ষিতের দেশে উপরতলার পাঠকদের রুচি আর মন যুগিয়ে চলবার তাগিদ আর যারই থাক্, আমরা কিন্তু চিরকালই সাহিত্যের পংক্তিভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছি বাংলার সর্বসাধারণকে। স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত—সবাই যাতে জ্ঞানের আলোকে তাঁদের অন্তরলোককে উদ্ভাসিত ক'রে তুলতে পারেন, সেদিকেই ছিল আমাদের লক্ষ্য। ঐ সাধু উদ্দেশ্যের তাগিদেই আমাদের পূর্বতন প্রচেষ্টার সঙ্গে এবার যোগ করছি সদ্য-প্রকাশিত 'জনশিক্ষা গ্রন্থমালা'।

আমরা হাত বাড়িয়ে চারদিকের অনেক কিছুকেই আঁকড়ে ধরতে পারি, কিন্তু দাঁড়াতে হ'বে পায়ের নিচেকার ঐ মাটিতেই। তাই বাইরের জগতের প্রভাব, শিক্ষাসংস্কৃতি কিংবা ব্যক্তিমানসের স্পর্শ থেকে নিজেদের বঞ্চিত না ক'রেও দেশের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ও ভাবধারার উপর নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার কল্পনা অবাস্তব নয়। প্রকৃতপক্ষে আমরা 'জনশিক্ষা গ্রন্থমালা'-পর্যায়ে যে ধরনের বই প্রকাশ করছি, তার অধিকাংশই আমাদের দেশীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, গল্পকাহিনী কিংবা লোকশিক্ষাকে অবলম্বন করেই রচিত হয়েছে।

কত যুগ পরে অবহেলিত জনসাধারণের প্রতি দৃষ্টি পড়েছে সরকারের। জনশিক্ষায় উদ্যোগী হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এই অনুকূল পরিবেশে আমরাও সরকারী প্রচেষ্টায় সহায়তা করে অশিক্ষার অভিশাপ দূরীকরণে সচেষ্ট হয়েছি।

যাঁদের জন্য আমাদের এই প্রচেষ্টা তাঁরা উপকৃত হ'লেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে। ইতি—

বিনীত

প্রকাশক

হর-গৌরীর সংসার—নিত্যই অভাব। সারাদিন ভিক্ষে ক'রে মহাদেব যা কিছু পান, দেখতে না দেখতে তা শেষ হয়ে যায়।

মহাদেবের ইচ্ছা হল সাত তরকারি দিয়ে ভাত খাবেন। তাই গৌরীকে রাঁধতে বললেন। কিন্তু ঘরে চাল বাড়ন্ত। আগের দিনের ভিক্ষার চাল ধার শুধতেই প্রায় শেষ হয়েছে—যা অল্প ক'টি ঘরে ছিল, তাও গণেশের ইঁদুরে শেষ ক'রে দিয়েছে। তাই মহাদেবের হুকুম শুনে গৌরী রেগে উঠে বললেন :—

আজিকার মত যদি বান্ধা দাও শূল।
তবে সে আনিতে নাথ পারি হে তণ্ডুল॥

শূল বাঁধা দেবার কথা বলতেই মহাদেব চটে গিয়ে বলতে থাকেন নিজের দুঃখের কথা—গণেশের ইঁদুর চাল খেয়ে ফেলে, কার্তিকের ময়ূর তার সাপকে তাড়া করে। তাঁর বলদ দানা-পানি পায় না, তার উপর গৃহিণীর জ্বালায় ঘরে শান্তি নেই।

তাই নন্দীকে ডেকে বললেন :

আন বাঘছাল শিঙাহাড়মাল
ডুম্বুর বিভূতি ঝুলি।
আইস হে নন্দী আমার সঙ্গী
ঘরে না রহিব শূলী ॥

ত্রিলোকের সর্বত্রই মহাদেবের পূজা প্রচারিত হয়েছে। কাজেই তাঁর আবার অসুবিধা কি? ঘর বাহির সবই সমান।

সত্যি সত্যি মহাদেব চলে গেলেন দেখে দেবী বসলেন বিলাপ করতে। তখন তাঁর দুঃখে তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন পদ্মা। বললেন :

আপনি শান্ত হোন—শীগ্‌গিরই মর্ত্যে আপনার পূজা প্রচারিত হবে। তারপর দেবীর আদেশে হনুমানের সাহায্য নিয়ে বিশ্বকর্মা বংসনদীর তীরে কলিঙ্গ নগরে দেবীর দেউল, সরোবর আর উদ্যান রচনা করলেন।

তারপর দেবী কলিঙ্গরাজকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে তাঁর পূজা করতে বললে কলিঙ্গরাজ তাঁর পূজা আরম্ভ করলেন।

বিন্ধ্য পর্বতের পশুরা দেবীর স্তুতি-বন্দনা করলে পর, দেবী সিংহকে রাজা, নেকড়েকে ছত্রধর, উটকে পুরোহিত, বাঘ, গণ্ডার ইত্যাদিকে পাত্র, ঘোড়াকে বাহন, বানরকে বাদ্যকর, নকুলকে বৈদ্য এবং অন্য অন্য পশুকে বিবিধ কাজের জন্য নিযুক্ত করলেন।

কিন্তু দেবীর পূজা মর্ত্যে তখনো ভালোভাবে প্রচারিত হয়নি। তাই তিনি ভাবলেন যদি কোন দেবতাকে তাঁর পূজা প্রচার করবার জন্যে পৃথিবীতে পাঠাতে পারেন, তবে ভাল হয়। তাই তিনি এক ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

অসুররা স্বর্গ দখল করবার চেষ্টা করছে শুনে ইন্দ্র শিব-পূজার আয়োজন করলেন। তাঁর পুত্র নীলাম্বরকে দিলেন ফুল তোলার ভার। দেবী চণ্ডী এক কীটের বেশে ঢুকলেন ফুলের মধ্যে। না জেনে নীলাম্বর সেই ফুল তুলে আনলেন পূজার জন্য। ইন্দ্রও সেই ফুলেই শিবপূজা করলেন। এদিকে কীটরূপিণী

চণ্ডীদেবী মহাদেবের মাথায় দংশন করলেন। তখন মহাদেব কুপিত হ'য়ে নীলাম্বরকে অভিশাপ দিলেন—মর্ত্যলোকে গিয়ে ব্যাধরূপে জন্ম নাও।

নীলাম্বর তখন কাঁদতে কাঁদতে নিজেকে শিবের পায়ে সঁপে দিয়ে বললেন :

বেচিল তোমার পায় নীলাম্বর নিজ কায়
যেন ইচ্ছা করহ তেমন।

নীলাম্বরের ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে মহাদেব বললেন :

হইয়া চণ্ডিকা ভক্ত অচিরে হইবে মুক্ত
আসিবে আপন নিকেতন॥

এইভাবে সান্ত্বনা পেয়ে নীলাম্বর স্বর্গ ত্যাগ করলেন আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পত্নী ছায়াও স্বামীর অনুগমন করলেন।

ধর্মকেতু ব্যাধ, তার স্ত্রী নিদয়া—আর তাদের পুত্র হলো কালকেতু। শিবের শাপে নীলাম্বরই কালকেতু-রূপে মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করলো। রূপে-গুণে কালকেতু অদ্বিতীয় হয়ে উঠলো। শৈশবেই সে হয়ে উঠলো শিশুদের দলপতি। ক্রমে কালকেতু যৌবনে উপনীত হলো।

সঞ্জয়কেতুর কন্যা ফুল্লরা—রূপে-গুণে তারও তুলনা নেই। নীলাম্বরের পত্নী ছায়াই ফুল্লরা-রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

কালকেতুর সঙ্গে ফুল্লরার বিয়ে হলো। পুত্রকে ঘর-সংসার করবার ভার দিয়ে বৃদ্ধ ধর্মকেতু আর তার স্ত্রী নিদয়া চলে গেল কাশীতে।

কালকেতু সকাল বেলায় তীর-ধনু হাতে নিয়ে বের হয়। বনে বনে ঘোরে, শিকার করে আর বেলা শেষে শিকার করা পশু কাঁধে নিয়ে বাড়ী ফিরে আসে। ফুল্লরা পশুর মাংস নিয়ে গ্রামে গ্রামে ফিরি ক'রে বেড়ায়। এই ভাবেই তাদের জীবন চলে।

অভাবের সংসার—বারোমাসই দুঃখ-জ্বালা লেগে থাকে। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মনে ছিল মিল—তাই এ দুঃখও তাদের সয়ে যায়।

কালকেতু বনে গিয়ে পশু বধ করে—তাই পশুরাজ সিংহ একদিন 'রণং দেহি'

মূর্তি নিয়ে হাজির হলো। কালকেতু বীর, সে পালাতে জানে না। তাই সে সিংহের সঙ্গেই যুদ্ধ করলো। যুদ্ধে কিন্তু কালকেতুরই জয় হলো।

পশুরা পরাজিত হয়ে দেবীর দেউলে গিয়ে দুঃখ নিবেদন করলো। দেবী তাদের রাজ্য তৈরি ক'রে দিয়েছিলেন, দিন কাটছিল সুখে; কিন্তু ব্যাধের ছেলে কালকেতু তাদের একে একে ধ্বংস ক'রে দিচ্ছে। দুঃখ ক'রে সবাই বলতে লাগলো যে বিনা অপরাধেই তারা প্রাণ হারাচ্ছে—মাও তাদের দয়া করছেন না।

কোন পশু বল্‌ছে:

নেউগী চৌধুরী নহি, না করি তালুক।

কাজেই কোথায়ই বা আর যাবো!

আবার কেউ বল্‌ছে:

বড় নাম বড় গ্রাম বড় কলেবর।
লুকাইতে নাহি ঠাঁই বীরের গোচর॥

কাজেই ধরা পড়ে মরা ছাড়া আর গতি নেই।

আবার কেউ বা বলে:

গর্তের ভিতর থাকি লুকি ভাল জানি।
কি করি উপায় বীর গর্তে ঢালে পানি॥

কাজেই গর্ত থেকে বেরিয়ে ধরা দেওয়া ছাড়া আর উপায় কি?

এমনিভাবে সিংহ, বাঘ, ভালুক, হাতী, গণ্ডার, বানর, সজারু সবাই তাদের দুঃখ নিবেদন করলে, দেবী তাদের আশ্বাস দিলেন যে এরপর থেকে তিনি তাদের রক্ষা করবেন।

এদিকে কালকেতু রোজকার মতো সেদিনও বনে গেল; কিন্তু সে আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলো যে বনের মধ্যে একটা পশুকেও দেখা যাচ্ছে না। এতদিন পর্যন্ত সে বনে ছিল পশুদেরই রাজত্ব, আজ সেখানে একটিও পশু দেখতে না পেয়ে অবাক্ হলো কালকেতু। শেষ পর্যন্ত ঘুরে ফিরে খালি হাতেই সে ঘরে চলে এলো।

একদিন, দুইদিন, তিনদিন—কালকেতু বনে যায় আর ঘুরে আসে। শিকার একেবারেই পায় না।—এ সব কিন্তু হচ্ছে দেবী চণ্ডীর মায়ায়। তিনি মায়াবলে সমস্ত পশুকে লুকিয়ে রেখেছিলেন।

কালকেতু এবারে প্রমাদ গুণলো। পশু শিকারই তার একমাত্র জীবিকা—ঘরে এককণা খুদকুঁড়া পর্যন্ত নেই। ফুল্লরাও আর পশরা নিয়ে বেরোয় না—গালে হাত দিয়ে বসে থাকে। শিকার না পেলে যে আর চলে না!

কালকেতু তীর-ধনু হাতে নিয়ে আবার গেলো বনে।

এদিকে দেবী চণ্ডী সোনা গোসাপের মূর্তি ধারণ ক'রে দেখা দিলেন কালকেতুকে। অন্যদিন হলে কালকেতু পাশ কাটিয়েই যেতো—কিন্তু আজ আর তার কোন বাচ-বিচার করলে চলবে না। তাই সে ধনুর গুণ দিয়ে বেঁধে ফেললো সেই গোসাপকে। তার পর সেটাকে কাঁধে ক'রে ফিরলো বাড়ীতে।

কিন্তু ফুল্লরা বাড়ীতে নেই। সে বাসি মাংসেই পশরা সাজিয়ে বেরিয়েছিল গ্রামে। কালকেতু তখন গোসাপটাকে ঘরে রেখে বের হলো ফুল্লরার খোঁজে। পথে ফুল্লরার দেখা পেয়ে সে তার মাথার পশরাটা নিজের মাথায় তুলে নিয়ে বেরুলো হাটের দিকে, আর ফুল্লরাকে পাঠিয়ে দিলো বাড়ীতে।

ফুল্লরা জানে ঘরে তার এককণা খুদও নেই—তাই সে চালের সন্ধানে গেলো এক সইয়ের বাড়ী। খানিক বসে সুখ-দুঃখের কথা বলবার পর সইয়ের কাছ থেকে দু'কাঠা চাল ধার নিয়ে ফুল্লরা ফিরলো বাড়ীতে।

এদিকে কালকেতু গোসাপকে ঘরে বেঁধে রেখে চলে যেতেই দেবী চণ্ডী এক অপূর্ব সুন্দরীর রূপ ধারণ করলেন। ফুল্লরা এসে হেন সুন্দরীকে ঘরে দেখে অবাক্ হলো।

ফুল্লরা দেবীর পরিচয় জিজ্ঞেস করলো। দেবী এমন হেঁয়ালীতে পরিচয় দিলেন যে ফুল্লরা তার কিছুই বুঝতে পারলো না। তারপর দেবী বললেন:

তুমি গো ফুল্লরা যদি দেহ অনুমতি।
এই স্থানে কতদিন করিব বসতি॥

দেবীর মুখে এই কথা শুনে ফুল্লরার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। এরকম সুন্দরী মেয়ে যদি ঘরে থাকে তবে তার উপায় কি হবে!

ফুল্লরা তখন তাকে নানাবিধ দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝাতে লাগলো যে, কুলের বৌ-এর পক্ষে নিজের ঘর ছেড়ে পরের ঘরে থাকা কোন রকমেই উচিত নয়।
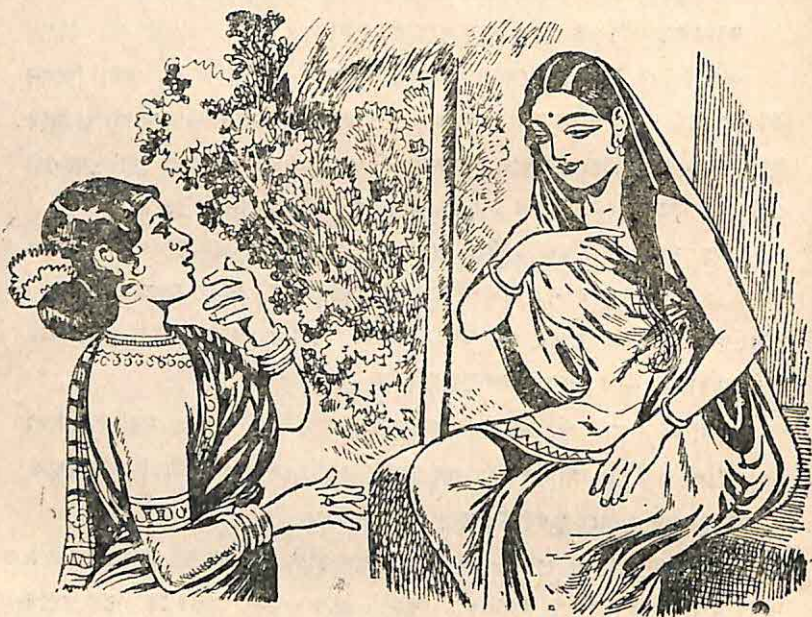
কিন্তু শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজে না—ফুল্লরার কথায় সেই সুন্দরী কন্যাও বুঝ মানলো না। সে বললো:

তোমরা শুধু আমায় ভক্তি করো, তোমাদের অনেক ধনরত্ন হবে, আমি তা আরো বাড়িয়ে দেবো।

কিন্তু ফুল্লরা তার কিছুই বোঝে না—দেবীর মায়াও সে বুঝতে পারে না। সে দেবীকে পতিভক্তির কথা শেখায়। কিন্তু দেবী উল্টো কথা বলেন :

মোর উপদেশে বা তোমার কিবা কাজ।
আপনি সে রক্ষা করি আপনার লাজ॥
আছিলাম একাকিনী বসিয়া কাননে।
আনিল তোমার পতি বান্ধি নিজগুণে॥

কালকেতুর গুণে বাঁধা পড়েছে ঐ সুন্দরী নারী। গতিক বড় সুবিধের নয় বুঝে ফুল্লরা তার দুঃখের কথা বলতে আরম্ভ করলো। সে দেবীকে বুঝিয়ে বললো, অনেক দুঃখে তারা দিন কাটায়, এখানে থেকে সুন্দরী কেন কষ্ট করবে?

কিন্তু দেবী তবুও যাবেন না। তখন কাঁদতে কাঁদতে ফুল্লরা ছুটলো গোলাহাটের দিকে, তার স্বামীর কাছে।

ফুল্লরার এই অবস্থা দেখে কালকেতু অবাক্ হলো। সে জিজ্ঞেস করলো ফুল্লরাকে : কি হয়েছে?

শাশুড়ী ননদী নাহি, নাহি তোর সতা।
কার সনে দ্বন্দ্ব কর‍্যা চক্ষু কৈলি রাতা॥

ফুল্লরা তখন দুঃখের কথা খুলে বললো। কার সে সুন্দরী নারীকে কালকেতু ঘরে নিয়ে এসেছে, যার রূপের ছটায় ঘর আলো হয়ে আছে।

ফুল্লরার কথায় ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো কালকেতু। পরস্ত্রীকে সে মায়ের মতোই দেখে, অথচ ফুল্লরা কি সব কথা বলছে?

ক্রুদ্ধ হয়ে বললো কালকেতু :

বেকত করিয়া রামা কহ সত্য ভাষা।
মিথ্যা হইলে চিয়াড়ে কাটিব তোর নাসা॥

তিন সত্য করে বললো ফুল্লরা :

মিথ্যে বলছি কি সত্যি বলছি, ঘরে এসে পরীক্ষা করে দেখো।

তাড়াতাড়ি পশরা গুটিয়ে নিয়ে কালকেতু ফুল্লরার সঙ্গে চললো নিজ. বাড়ীর দিকে। দূর থেকেই বাড়ীর দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলো—

তিমির কেটেছে যেন
তপন-তরাসে।

কোন্ দেবীর আলোকে সমস্ত বাড়ী আলোকিত হ'য়ে আছে। কে সেই অপূর্ব সুন্দরী—নারী কি দেবী, তাও সে জানে না, তবু মাতৃ জ্ঞানেই তাকে
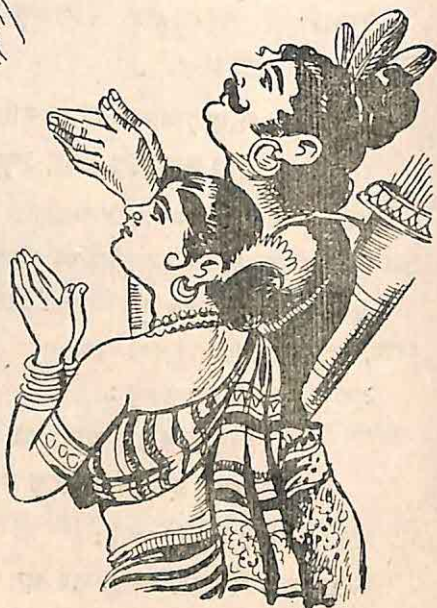
কালকেতুর দেবী দর্শন

প্রণাম ক'রে কালকেতু হাত-জোড় ক'রে বললে :

এখানে তুমি কোথায় থাকবে মা। তোমার নিজের ঘরে ফিরে যাও; আমি তোমায় রেখে আসবো।

কিন্তু কালকেতুর কথায় দেবীর মন উঠে না। তিনি এখানেই থাকবেন। তখন কালকেতু ক্রুদ্ধ হয়ে ধনুকে তীর লাগালো—কিন্তু দেবীর মায়ায় সেই তীর ধনুকেই আটকে রইলো, আর বেরুতে পারলো না।

এই ব্যাপার দেখে কালকেতু ফুল্লরা দু'জনেই অবাক্ হয়ে গেল। কিন্তু তারপর ঘটলো আরও আশ্চর্য ব্যাপার—দেবী সহসা মহিষ-মর্দিনী রূপ ধারণ করলেন। কালকেতু বুঝলো—সাক্ষাৎ মহামায়া তার ঘরে এসেছেন। এইবার সে হাতজোড় ক'রে প্রার্থনা করতে লাগলো।

দেবী আবার পূর্বরূপ ধারণ করলেন। তারপর কালকেতুর স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে দেবী তাকে একটা মাণিকের আংটি দিলেন। কিন্তু ফুল্লরার মন উঠলো না। সে বলে:

এক গোটা অঙ্গুরীতে হবে কোন কাম।
সারিতে নারিবে প্রভু ধনের দুর্নাম॥

তারপর দেবী যখন বললেন যে, এর দাম শত কোটি টাকা—ফুল্লরার কিন্তু তা বিশ্বাস হ'লো না—সে মুখ বাঁকালো।

দেবী বুঝলেন, ফুল্লরা খুশী হয়নি। তখন তিনি ডালিম গাছের নীচে পোঁতা সাত ঘড়া ধন পাইয়ে দিলেন কালকেতুকে। কিন্তু সাত ঘড়া ধন একসঙ্গে তারা নেয় কি ক'রে, দেবী ভক্তের অধীন—তাই নিজেই কোলে কাঁখে ক'রে সেই ঘড়া পৌঁছে দিতে গেলেন কালকেতুর ঘরে।

আগু আগু মহাবীর করিল গমন।
পশ্চাতে চলিলা মাতা লয়্যা তার ধন॥
মনে মনে মহাবীর করেন যুকতি।
ধনঘড়া লয়ে পাছে পালায় পার্বতী॥

কিন্তু দেবী পালালেন না—যথাস্থানে কালকেতুর ধন পৌঁছে দিয়ে বললেন: নগরের মধ্যে আমার মন্দির নির্মাণ ক'রে প্রতি মঙ্গলবার নানা দ্রব্য দিয়ে

আমার পূজা করবে। এইভাবে পূজা করলে আমার বরে তুমিই হবে গুজরাট নগরের রাজা।

কিন্তু কাজটা যত সহজ ক'রে দেবী বললেন, কালকেতুর নিকট তা' তত সোজা মনে হলো না। পূজা-আর্চার ব্যাপার বামুন ছাড়া হয় কি ক'রে? বিশেষত—

অতি নীচ কুলে জন্ম জাতিতে চোয়াড়।
কেহ না পরশ করে লোকে বলে রাঢ়॥

দেবীই এই প্রশ্নের মীমাংসা করে দিলেন। তিনি কালকেতুর কানে মন্ত্র পড়লেন, আর বললেন :

পবিত্র হইলে তুমি আমা দরশনে।
নিবেক তোমার দান উত্তম ব্রাহ্মণে॥

এইভাবে কালকেতুকে বর দিয়ে দেবী চণ্ডী চলে গেলেন কৈলাসে। কালকেতুর সাহায্যেই এখন পৃথিবীতে দেবীর মহিমা প্রচার হবে।

কালকেতুর টাকার দরকার। তাই দেবীর দেওয়া মাণিক্যের আংটি নিয়ে সে গেলো মুরারি শীলের কাছে। মুরারি শীল ধূর্ত বেনে। সে কালকেতুকে বুঝাতে চাইলো যে এটা পিতলের আংটি, কাজেই এর মূল্য বেশী হবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চণ্ডীর আদেশ পেয়ে মুরারি শীল কালকেতুকে আর ঠকাতে পারলো না, আংটির উচিত মূল্যই দিলো।

সেই টাকায় বন কাটিয়ে পত্তন হলো গুজরাট রাজ্যের, এবং রাজ্যের জন্য দরকারী জিনিসপত্রও খরিদ করা হলো।

প্রথমেই তৈরী হলো চণ্ডীর মন্দির, তারপর হলো অন্য সব বাড়ি ঘর। কিন্তু লোকজন কেউ আসতে চায়'না এ নূতন রাজ্যে। কালকেতু আবার দেবীর শরণ নিলো। তখন দেবী পাশের রাজ্য কলিঙ্গের লোকদের স্বপ্নাদেশ দিলেন গুজরাটে এসে বাস করতে। আর এদিকে দেবী সমুদ্র আর ইন্দ্রের সহায়তা নিয়ে কলিঙ্গে

আরম্ভ করলেন বান আর বৃষ্টি। লোকে কলিঙ্গ ছেড়ে গুজরাটে এসে বাস করতে আরম্ভ করলো।

বুলান মণ্ডল এলো কালকেতুর কাছে, এলো আরো অনেক প্রজা। তারা সবাই কালকেতুর আশ্বাস পেয়ে গুজরাটেই পাকাপাকি ভাবে থাকবে ঠিক করলো।
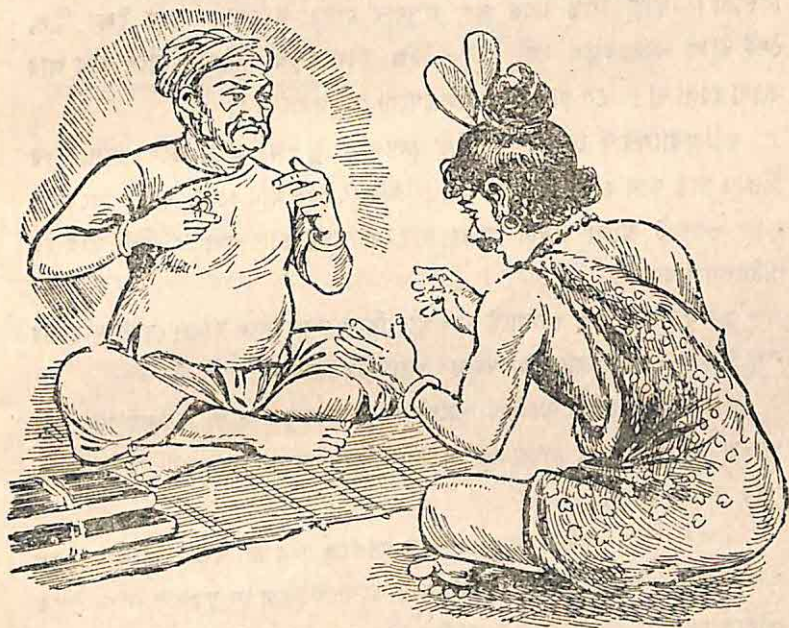
কত ব্রাহ্মণ সজ্জন, ক্ষত্রিয় বৈশ্য, কামার, কুমার আর মুসলমান এলো গুজরাটে, তার আর সীমা নেই। এদের সঙ্গেই এলো ভাঁড়ু দত্ত।

বড় ধূর্ত লোক এই ভাঁড়ু। মিষ্টি কথায় কালকেতুকে 'খুড়া' বলে ডেকে সে তার আপন উদ্দেশ্যে সিদ্ধ করতে থাকে।

কালকেতু গুজরাটে হাট বসিয়েছিল—ভাঁড়ু দত্ত জোর-জবরদস্তি শুরু করলো হাটে। গরীব গ্রামবাসীরা যে সমস্ত তরিতরকারি নিয়ে আসে, ভাঁড়ু জোড় ক'রে তা কেড়ে-কুড়ে নেয়। রাজা কালকেতুর সঙ্গে তার খুব খাতির—এইজন্যে দোকানদাররাও কিছু বলতে সাহস পায় না। তারপর ক্রমে ক্রমে কথাটা রাজার কানে উঠলো। কালকেতু তখন ভাঁড়ুকে ডেকে এনে শাসালো এবং জবাবদিহি চাইলো। ভাঁড়ু কিন্তু এতে খুব অপমান বোধ করলো। তার ইচ্ছা ছিল, সেই রাজা কালকেতুর মন্ত্রী হবে—কিন্তু কালকেতুর মতিগতি দেখে তার আর ভরসা হলো না। সে রাগ করে চলে গেলো কলিঙ্গরাজ্যে।

কলিঙ্গরাজের কানে অনেক কথাই তুললো ভাঁড়ু দত্ত—ক্রমে ক্রমে কালকেতুর বিরুদ্ধে তাঁর কান ভারী ক'রে তুললো। কলিঙ্গরাজের মনে হলো, যদি কালকেতুর নূতন গুজরাট রাজ্য এমনি পাওয়া যায় তো খুবই ভাল কথা। তিনি তাঁর চর পাঠালেন গুজরাটে।

কলিঙ্গরাজার চর গুজরাটে এসে ঘুরে ফিরে দেখে গিয়ে বললে যে ভাঁড়ু দত্তের কথা ঠিকই—গুজরাটরাজ্যের ধনরত্নের আর সীমা নেই।

কলিঙ্গরাজ গুজরাট আক্রমণ করলেন। কালকেতুর সঙ্গে কলিঙ্গরাজের যুদ্ধ আরম্ভ হলো। যুদ্ধে কালকেতু পরাজিত হয়ে ফুল্লরার পরামর্শে ধানের গোলায় গিয়ে লুকিয়ে রইল।

এদিকে ভাঁড়ু খুড়ীমা বলে ডাকতে ডাকতে এসে উপস্থিত হলো কালকেতুর অন্দরমহলে, সেখানে ফুল্লরার হিতৈষী সেজে কলে-কৌশলে সে ফুল্লরার কাছ থেকে কালকেতুর খবর বার করলো তারপর গিয়ে জানালো তা' কলিঙ্গরাজের কাছে।

কলিঙ্গরাজ ধানের গোলা থেকে কালকেতুকে বন্দী করলো।

কালকেতু কারাগারে বিপন্ন অবস্থায় চণ্ডীর স্তব পাঠ করতে লাগলো। চণ্ডী সন্তুষ্ট হয়ে কালকেতুকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করলেন এবং কলিঙ্গরাজকে স্বপ্নাদেশ দিলেন যে কালকেতু তাঁর ভক্ত—তার রাজ্য যেন তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

ভয় পেয়ে কলিঙ্গরাজ মহাসমাদর ক'রে কালকেতুকে তার রাজ্য ফিরিয়ে

দিলেন। দেবীর কৃপায় মৃত সৈন্যরাও আবার বেঁচে উঠলো—জাঁকজমক ক'রে কালকেতু আবার সিংহাসনে বসলো।

কালের চাকা ঘুরে গেছে দেখে ভাঁড়ু দত্ত আবার এসে কালকেতুকে খোসামোদ করতে লাগলো।

প্রণাম করিয়া ধীরে ভাঁড়ু নিবেদন করে,
খুড়া দেখি ঘুচিল আন্ধার ॥

তারপর মায়াকান্না কেঁদে বললো :

খুড়া তুমি হৈলে বন্দী অনুক্ষণ আমি কান্দি
বহু তোমার নাহি খায় ভাত।

কিন্তু কালকেতু তার কথায় ভুললো না, ভাঁড়ু দত্তকে সে চিনে ফেলেছে। বহু অপমান করে শেষ পর্যন্ত তাকে তার বাড়িঘর ফিরিয়ে দিলো। তার রাজ্য নিষ্কণ্টক হলো।

কালকেতুর পুত্র হ'লো। তারপর সেই পুত্র যোগ্য হলে তার হাতে রাজ্যভার দিয়ে কালকেতু আর ফুল্লরা শাপ ভোগ শেষ ক'রে স্বর্গে ফিরে গেল।

কালকেতুকে দিয়ে মর্ত্যে দেবী চণ্ডীর পূজা প্রচারিত হবার পর এবার দেবীর ইচ্ছা হলো—স্ত্রী-লোকের সাহায্যেও তাঁর পূজার প্রচার হওয়া দরকার। শীঘ্রই তা পূর্ণ হবার সুযোগ ঘটলো।

স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের সভায় অনেক নর্তকী অপ্সরী নাচে গায়। একদিন কোন কারণে নাচতে নাচতে নর্তকী রত্নমালার তালভঙ্গ হলো—ফলে ইন্দ্র তাকে অভিশাপ দিলেন। সে মর্ত্যে এসে জন্মগ্রহণ করলো। দেবী চণ্ডী তারই সাহায্যে মর্ত্যে তাঁর পূজা প্রচার করবেন স্থির করলেন।

ইছানী নগরে থাকেন সাধু লক্ষপতি,—জাতিতে বণিক্। অবস্থা ব্যবস্থাও বেশ ভাল। খুব লক্ষীমতী তাঁর স্ত্রী—নাম তার রম্ভাবতী। শাপভ্রষ্টা রত্নমালা এসে জন্ম নিলো তাদেরই ঘরে নাম হলো তার খুলনা।

খুলনার রূপগুণের অন্ত নাই। দিনে দিনে সে শশিকলার ন্যায় বড় হয়ে উঠতে লাগলো। বাপ-মা যোগ্য পাত্রের খোঁজ করতে লাগলেন।

উজানী নগরে থাকেন যুবক ধনপতি সদাগর। কুলে-শীলে-মানে আর বিদ্যা-বুদ্ধিতে ধনপতি ছিলেন বণিকদের চূড়ামণি। সেই ধনপতি একদিন জনার্দন ওঝার সঙ্গে পায়রা উড়ানোর খেলা খেলছিলেন। এদিকে হঠাৎ কোথা থেকে এক বাজ এসে দেখা দিল—আর সেই বাজের তাড়া খেয়ে ধনপতির পায়রা দূরে ছুটে পালিয়ে গেলো।

খেলা করছিল খুল্লনা, এমন সময় বাজের তাড়া খেয়ে পায়রা এসে লুকালো তার আঁচলের তলায়। ধনপতি সদাগর তার পায়রা খুঁজে খুঁজে এসে উপস্থিত
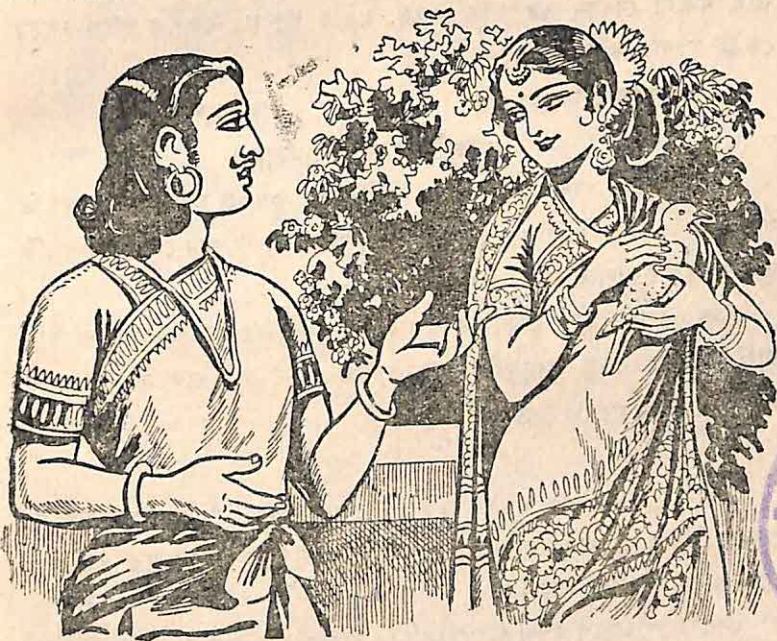
ধনপতি তার পায়রা ফিরিয়ে চাইল।

হলেন খুল্লনার কাছে। ধনপতি তাঁর পায়রা ফিরিয়ে চাইলেন কিন্তু খুল্লনা পায়রা দিতে রাজী হলো না। তারপর যখন সে জানতে পারলো যে, ধনপতি সদাগর

তারই খুড়তুতো বোন লহনাকে বিয়ে করেছেন, তখন সম্পর্কের সুযোগ নিয়ে সে মুখ ঘুরিয়ে চলে এলো বাড়িতে—ধনপতির পায়রা সঙ্গে নিয়েই।

পায়রার জন্যে ধনপতির দুঃখ নেই—তিনি খুল্লনার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছেন, তাকে বিয়ে করতে চান। জনার্দন ওঝাকে ধরলেন ঘটকালির জন্যে।

এই জনার্দন ওঝাকে লক্ষপতি সদাগরও পাঠিয়েছিলেন কন্যার যোগ্য বর সন্ধান করবার জন্য। এতদিন ধরে যত খোঁজ নিয়েছে তার কোন পাত্রই সর্বগুণসম্পন্ন নয়। এবার মনোমত পাত্রের সন্ধান পেয়ে জনার্দন ফিরে এলো লক্ষপতির কাছে। এসে বললো যেখানে যত পাত্র আছে, গঙ্গার দুকূলে যত বর আছে তাদের কেউই খুল্লনার যোগ্য নয়, শুধু—

তোমার কন্যার মত বর ধনপতি দত্ত
কুলেশীলে রূপে গুণবান।

কিন্তু দোষের মধ্যে এই ধনপতি বিবাহিত। কাজেই মন উঠে না লক্ষপতি সদাগরের কিন্তু ধনপতির কুলশীল বিদ্যা-বুদ্ধির সংবাদ শুনে শেষটায় লক্ষপতি তার হাতেই কন্যাদানে সম্মত হলেন।

কিন্তু এবার বেঁকে দাঁড়ালেন রম্ভাবতী। সতীনের ঘরে মেয়ে দিতে তিনি রাজী নহেন। কিন্তু রম্ভাবতীর কান্নাকাটিতে কোন কাজ হলো না। ধনপতি সদাগরের সঙ্গেই খুল্লনার বিয়ে হয়ে গেলো।

উজানীর রাজা এক জোড়া শুকসারী পেয়েছিলেন। কিন্তু তাদের উপযুক্ত সোনার পিঁজরা পাওয়া গেলো না রাজ্যে। তাই রাজা ধনপতি সদাগরকে পাঠালেন গৌড় রাজ্যে পিঁজরার জন্যে।

ধনপতি গৌড়দেশে রওনা হয়ে গেলেন। যাবার সময় লহনার হাতেই দিয়ে গেলেন খুল্লনার ভার। স্বামীর কথায় লহনাও খুল্লনার খুব যত্ন-আত্তি করতে লাগলো। কিন্তু তাতে বাদ সাধলো দুর্বলা নামে এক দাসী।

নাম দুর্বলা হলে কি হবে—সে ছিল ভারী হিংসুটে। দাসী ভাবলো—দুই

সতীনে যদি এত মিল থাকে, তবে তার স্থবিধে হয় না। বরং দু'জনে যদি ঝগড়া বাঁধে, তবে একজনের কাছে অপরের নিন্দা ক'রে সে দু'জনের কাছ থেকেই অনেক কিছু গুছিয়ে নিতে পারবে। এই ভেবে সে লহনাকে কুপরামর্শ দিতে লাগলো।

দুর্বলা লহনাকে বুঝালো যে, ধনপতি সদাগর আর আগের মত তাকে ভালবাসে না, তার চেয়ে খুল্লনাকেই বেশি ভালবাসে; কাজেই আদর যত্ন না

করে এখন খুল্লনাকে দুঃখ কষ্ট দেওয়াই দরকার। লহনাও বুঝলো যে দুর্বলা ঠিক কথাই বলেছে। তখন সে তার এক সখী আর দুর্বলার কথায় খুল্লনাকে স্বামীর এক জাল পত্র দেখালো—তাতে লেখা ছিলো—

'আজ থেকে তুমি ছাগল চরাবে, ঢেঁকিশালে ঘুমোবে, এক বেলা আধপেটা খাবে আর ছেঁড়া কাপড় পরবে।'

পত্র পড়েই খুল্লনা বুঝতে পারলো যে, এ চিঠি জাল—তাই সে পত্রের কথা মত কাজ করতে রাজী হলো না। কিন্তু লহনা এমন জোর-জবরদস্তি করতে লাগলো যে খুল্লনাকে শেষ পর্যন্ত রাজী হতেই হলো।

খুল্লনা বাধ্য হয়েই ছাগল চরাতে যায়, ঢেঁকিশালে শোয় আর আধ-পেটা খেয়ে থাকে।

বনে বাদাড়ে ছাগলের পাল নিয়ে ঘুরে ঘুরে দুঃখকষ্টে তার দিন যায়। একদিন ছাগল চরাতে গিয়ে স্বামীর কথা চিন্তা করতে করতে খুল্লনা বনের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লো। এমন সময় দেবী চণ্ডী তার একটি ছাগলকে লুকিয়ে রাখলেন এবং তার মা রম্ভাবতীর রূপ ধরে তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন :

কত দুঃখ আছে ঝি গো তোমার কপালে।
সর্বশী ছাগল তোর খাইল শৃগালে॥

স্বপ্ন দেখে ধড়মড় ক'রে জেগে উঠলো খুল্লনা। চারিদিকে তাকালো—কিন্তু কোথাও সে সর্বশী ছাগলকে দেখতে পেলো না। সে মায়ের উদ্দেশে বিলাপ করতে করতে চারিদিকে ছাগল খুঁজে বেড়াতে লাগলো।

এদিকে দেবী অষ্ট বিদ্যাধরীকে সরোবরের তীরে মঙ্গলচণ্ডীর পূজায় বসিয়ে রাখলেন। খুল্লনা ছাগল খুঁজতে খুঁজতে এসে দেখতে পেলো বিদ্যাধরীদের। বিদ্যাধরীরা তার দুঃখের কথা শুনে খুল্লনাকে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করতে উপদেশ দিলেন এবং চণ্ডীর পূজা শিখিয়ে দিলেন। খুল্লনা সেইভাবে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করলো—দেবী খুশী হয়ে তাকে স্বামী-পুত্র লাভের বর দিয়ে চলে গেলেন।

ওদিকে চণ্ডী লহনাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, সে যেন খুল্লনাকে আগের মতোই আদর-যত্ন করে। স্বপ্ন দেখে লহনার ঘুম ভেঙ্গে গেলো—তার মনে এবার অনুতাপ জাগলো। খুল্লনা ঘরে ফিরে এলে লহনা আবার তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলো—দুই সতীনে আবার মিলন হলো।

ধনপতি সদাগর গৌড়ে গিয়ে বাড়ি-ঘরের কথা ভুলে নানা আমোদ প্রমোদে

মত্ত ছিলেন। দেবীর দয়ায় অচিরেই ধনপতিও দেশে ফিরে এলেন। খুল্লনার দুঃখ দূর হলো।

এরপর কিন্তু দেখা দিলো এক সামাজিক গণ্ডগোল। ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে স্বজাতিবর্গ এসে উপস্থিত হলেন ধনপতির গৃহে—তখন মালা-চন্দন দেওয়া নিয়েই গণ্ডগোল দেখা দিল। খুল্লনা বনে ছাগল চরাতো—কাজেই তার সতীত্ব-সম্বন্ধে সন্দেহ জেগেছে স্বজাতিবর্গের মনে। এক্ষণে হয় খুল্লনার সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হইবে, নইলে শাস্তিস্বরূপ ধনপতিকে এক লক্ষ টাকা দিতে হবে।

লহনা যদি খুল্লনাকে ছাগল চরাতে না পাঠাতো তবে আর একথা উঠতো না। কাজেই ধনপতি লহনাকে তার কাজের জন্যে গাল দিয়ে খুল্লনাকে এই বলে প্রবোধ দিলো যে লক্ষটাকা দিয়েই সমাজের লোকদের মুখ বন্ধ করবে সে। কিন্তু খুল্লনা তাতে রাজী হলো না, সে সতীত্বের পরীক্ষাই দিবে।

সকলের সামনে খুল্লনার সতীত্বের পরীক্ষা হলো। তাকে জলে ডুবাতে চেষ্টা করা হলো, সাপ দিয়ে দংশানো হলো, পোড়া লোহার ছেঁকা দেওয়া হলো এবং শেষ পর্যন্ত জতু-গৃহে পোড়ানোর চেষ্টা করা হলো—কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। খুল্লনা সতীত্বের পরীক্ষায় জয়লাভ করলো।

আবার সুখেই দিন যায়।

কিছুদিন পর উজানীর রাজভাণ্ডারে চন্দন কাঠের অভাব ঘটলো। রাজা তখন ধনপতি সদাগরকে পাঠালেন সিংহল দ্বীপে চন্দনের জন্য। খুল্লনা তখন গর্ভবতী, তাছাড়া ধনপতির যাত্রার সময়টাও ছিল অশুভ। তাই খুল্লনা পতির মঙ্গল কামনায় ভক্তিভরে দেবী মঙ্গলচণ্ডীর পূজায় বসলো।

ধনপতি সদাগর ছিল পরম শৈব—শিব ছাড়া অন্য কোন দেবতাকেই তিনি মানতেন না। পূজার কথাটা তাঁর কানে উঠতেই ক্রুদ্ধ হয়ে এসে দেবীর ঘট পায়ে ঠেলে খুল্লনাকে তিনি গালাগাল করলেন।

যাত্রা কালে নানা অমঙ্গল দেখা দিলো—কিন্তু ধনপতি কিছুই মানলেন না,

মনে মনে শিবের নাম স্মরণ করে সাত ডিঙ্গা বোঝাই করে তিনি সিংহল যাত্রা করলেন।

ধনপতি চণ্ডীর ঘটে লাথি মেরেছিলেন—এইবার অকূল সমুদ্রে পেয়ে দেবী তার শোধ নিলেন। দেবীর ক্রোধে ধনপতির ছয় ডিঙ্গা ডুবলো, তাঁর স্বরূপ নষ্ট

পূজার কথাটা ধনপতির কানে উঠতেই ক্রুদ্ধ হয়ে এসে…পৃষ্ঠা—২৫

হলো। একমাত্র 'মধুকর ডিঙ্গা' নিয়ে ধনপতি অনেক কষ্টে কালীদহে এসে পৌঁছুলেন। সেখানে দেখতে পেলেন এক অপূর্ব দৃশ্য—কমলে-কামিনীর মূর্তি। কমলের উপর এক কামিনী—

ধরি রামা বাম করে সংহারয়ে করিবরে
উগারিয়া করয়ে সংহার।

এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে ধনপতি গিয়ে পৌঁছুলেন সিংহলে।

সিংহলরাজ ধনপতির পরিচয় পেয়ে খুবই সমাদর করলেন আর সেখানে ব্যবসা করে সদাগরের লাভও হলো যথেষ্ট।

কথাপ্রসঙ্গে একদিন ধনপতি সিংহলরাজকে বললেন সেই কমলে-কামিনীর কথা। রাজার কিন্তু বিশ্বাস হলো না। তখন ধনপতি বললেন, যদি তিনি কমলে-কামিনী না দেখাতে পারেন তবে তাঁর সব ধনরত্ন রাজা পাবেন, আর তিনি বারো বছর কারাগারে বন্দী হয়ে থাকবেন।

রাজাও বললেন, যদি ধনপতির কথা সত্য হয়, তবে তিনি তাকে তাঁর অর্ধেক রাজ্য দেবেন।

ধনপতি তোড়জোড় ক'রে সিংহলরাজকে নিয়ে গেলেন কালীদহে। কিন্তু কমলে-কামিনী আর দেখা দিলেন না।

সিংহলরাজ ধনপতির সমস্ত ধনরত্ন বাজেয়াপ্ত করলেন আর কথামত তাঁকে কারাগারে বন্দী করে রাখলেন।

এদিকে খুল্লনার এক পুত্র হলো। তার নাম রাখা হলো শ্রীমন্ত। মালাধর গন্ধর্বই শিবের শাপে খুল্লনার গর্ভে জন্ম নিয়েছিলো। শ্রীমন্ত ক্রমে বড় হলো। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে এখন সে পাঠশালায় পড়তে যায়। পড়ুয়ারা শ্রীমন্তকে তার বাবার কথা জিজ্ঞাসা করে। শ্রীমন্ত তার বাপকে দেখেনি, কিছুই বলতে পারে না সে। কিন্তু বাপের জন্য তার মন আকুল হয়।

অনেকদিন হয়ে গেছে—ধনপতি সদাগর ফিরেও আসেনি, কিংবা তার কোন খবরও পাওয়া যায়নি। শ্রীমন্ত তখন স্থির করলো—যেভাবেই হোক্ পিতার খবর সে আনবে—তাকে খুঁজে বার করবেই।

সাত ডিঙ্গা সাজিয়ে শিশু-সদাগর শ্রীমন্ত পিতার উদ্দেশে সিংহল যাত্রা করলো। দাদামশাই নিষেধ করলেন, মা কাঁদলেন—কিন্তু শ্রীমন্তের প্রতিজ্ঞা অটল—কোন মতেই তাকে ফিরানো গেলো না। তখন মঙ্গলচণ্ডীর পূজা ক'রে দেবীর ভরসায় খুল্লনা শ্রীমন্তকে ছেড়ে দিলো।

ধনপতির পথ ধরেই শ্রীমন্ত চললো সিংহলের দিকে। ভাগীরথী ছেড়ে তার ডিঙ্গা পড়লো সাগরে—তারপর নীলাচল, সেতুবন্ধ পার হয়ে শ্রীমন্তের ডিঙ্গা গিয়ে পৌঁছালো কালীদহে।

অপূর্ব দৃশ্য—সেই কমলে-কামিনী মূর্তি।

ধনপতির মতোই শ্রীমন্তও দেখলো সেই দৃশ্য—আর কেউ দেখতে পেলো না। শ্রীমন্ত গিয়ে পৌঁছালো সিংহলে।

সিংহলরাজের সঙ্গে দেখা ক'রে শ্রীমন্তও বললো সেই কমলে-কামিনীর অদ্ভুত বিবরণ। রাজা এবারও অবিশ্বাস করলেন। কিন্তু শ্রীমন্ত জোর দিয়েই বললো যে সে রাজাকে কমলে-কামিনী মূর্তি দেখাতে পারবে। রাজা বললেন যদি তা সত্যি হয়, তবে তিনি অর্ধেক রাজ্যসহ রাজকন্যাকে শ্রীমন্তের হাতে তুলে দেবেন, আর যদি তার কথা মিথ্যা হয়, তবে প্রাণদণ্ড হবে।

শ্রীমন্ত তাতেই রাজী হয়ে রাজাকে নিয়ে গেলো কালীদহে। কিন্তু দেবী তাকে ছলনা করলেন—দেখা দিলেন না। রাজা তাকে বন্দী ক'রে কোটালের হাতে সমর্পণ করলেন।

কোটাল শ্রীমন্তকে নিয়ে গেলো দক্ষিণ মশানে।

বিদেশে এসে বিপদে পড়ে শ্রীমন্তের মাকে মনে পড়লো, আর মনে পড়লো মা চণ্ডীকে।

শ্রীমন্ত কোটালকে অনেক মিনতি ক'রে একটু সময় চেয়ে ধানদূর্বা নিয়ে মশানেই মা চণ্ডীর পূজা করলো, তারপর মনপ্রাণে দেবীর স্তব আরম্ভ করলো।

স্তবে তুষ্ট হয়ে দেবী চণ্ডী এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশ ধরে এসে মশানে দেখা দিলেন আর কোটালকে বললেন যে, তার নাতিটি হারিয়ে গিয়েছিল, এখানে এসে তাকে খুঁজে পেয়েছেন! কোটাল যেন তাকে ছেড়ে দেয়।

কিন্তু কোটাল তাঁর কথা শোনে না। রাজার চাকর সে, রাজার হুকুম পালন না করে তার উপায় নেই; শ্রীমন্তকে সে বধ করবেই। তখন দেবী শ্রীমন্তকে কোলে নিয়ে বসলেন। কোটাল সদল-বলে বহু চেষ্টা করেও কিছুতেই শ্রীমন্তকে

ছিনিয়ে নিতে পারলো না। সে খবর দিলো রাজাকে। রাজা সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এলেন মশানে। দেবীর মায়ায় তখন ভূত-প্রেত, দত্যি-দানারা এসে রাজার
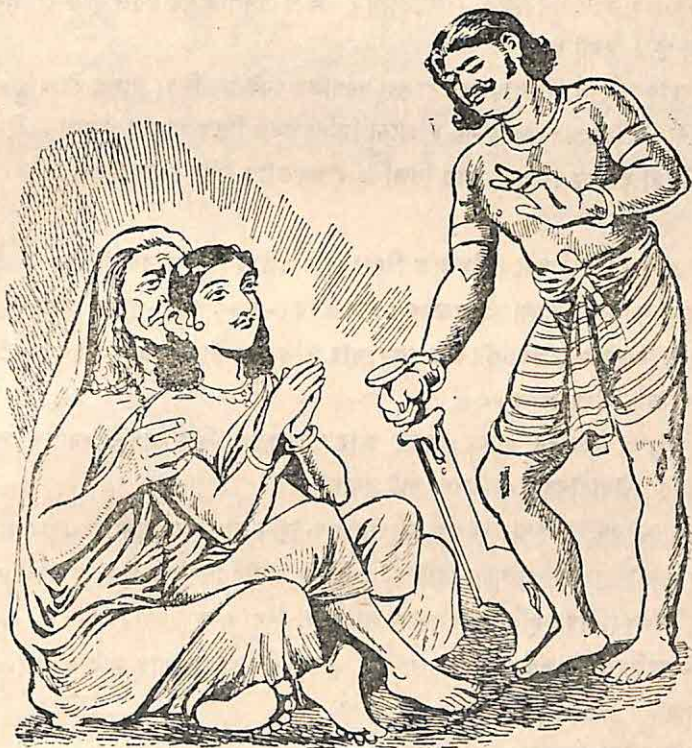
সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করলো। সেই যুদ্ধে রাজার সৈন্যরা পরাজিত হলে রাজা দেবীর শরণাপন্ন হলেন। দেবী সন্তুষ্ট হয়ে মৃত সৈন্যদের প্রাণদান করলেন।

দেবী তখন শ্রীমন্তকে উজানীনগরে গিয়ে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা প্রচার করবার আদেশ দিয়ে চলে গেলেন।

দেবী চণ্ডী প্রসন্ন হয়েছেন। এবার শ্রীমন্ত সিংহল-রাজকে কালীদহে নিয়ে গেলে পর সকলে কমলে-কামিনী মূর্তি দেখতে পেলেন। রাজার প্রতিশ্রুতি মত রাজকন্যার সঙ্গে শ্রীমন্তের বিয়ে হলো। আর ধনপতি সদাগরও মুক্তি পেলেন। পিতা-পুত্রে মিলন হলো।

তারপর দেবীর কৃপায় ডুবে যাওয়া ধনপতির সেই ছয় ডিঙ্গা জলের উপর ভেসে উঠলো। শ্রীমন্তের চেষ্টায় সব হারানো জিনিসপত্রও ফিরে পাওয়া গেলো। শ্রীমন্ত সাতডিঙ্গা ধনরত্নে বোঝাই করে পিতা ও রাজকন্যাকে নিয়ে দেশে রওনা হলো।

এদিকে উজানীনগরে শ্রীমন্তকে বিদায় দিয়ে মায়ের দিন ভাবনা-চিন্তায় কাটে। অনেকদিন হয়ে গেলো শ্রীমন্তেরও কোন খবর নেই। স্বামী-পুত্রের মঙ্গলের জন্য খুল্লনা দিনরাত মা মঙ্গলচণ্ডীকে ডাকেন আর ভক্তিভরে তাঁর পূজা করেন। তাঁর ডাকে দেবী প্রসন্ন হলেন।

তারপর একদিন ধনের বোঝা আর পুত্র-পুত্রবধূ নিয়ে ধনপতি সদাগর ফিরে এলেন। উজানীনগরে আনন্দের হাট বসলো।

মা মঙ্গলচণ্ডীর কৃপায় ধনপতি আবার সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করেছেন। এবার আর তাঁর দেবী পূজায় আপত্তি নাই। একদিন মাটির শিবলিঙ্গ পূজা করতে গিয়ে ধনপতি অর্ধনারীশ্বর মূর্তি দেখে বুঝতে পারলেন, শিব আর দেবী অভিন্ন। তখন তিনি ভক্তিভরে দেবীর পূজা করলেন এবং দেবীর বরে আবার তাঁর স্বরূপ ফিরে পেলেন।

উজানীর ঘরে-ঘরে মা মঙ্গলচণ্ডীর পূজা আরম্ভ হলো। উজানীনগর থেকে দেবীর পূজা সর্বত্র প্রচার হলো।

উজানীর রাজাকে কমলে কামিনী দেখিয়ে শ্রীমন্ত তার মেয়ে জয়াবতীকেও বিবাহ করলো। সুখেই তাদের দিন কাটতে লাগলো।

মর্ত্যে দেবীর পূজা প্রচার হয়েছে। যে কাজের জন্য খুল্লনা পৃথিবীতে এসেছিলেন তা পূর্ণ হলো। এবার পুষ্পক-রথে চড়ে তিনি স্বর্গে গেলেন।
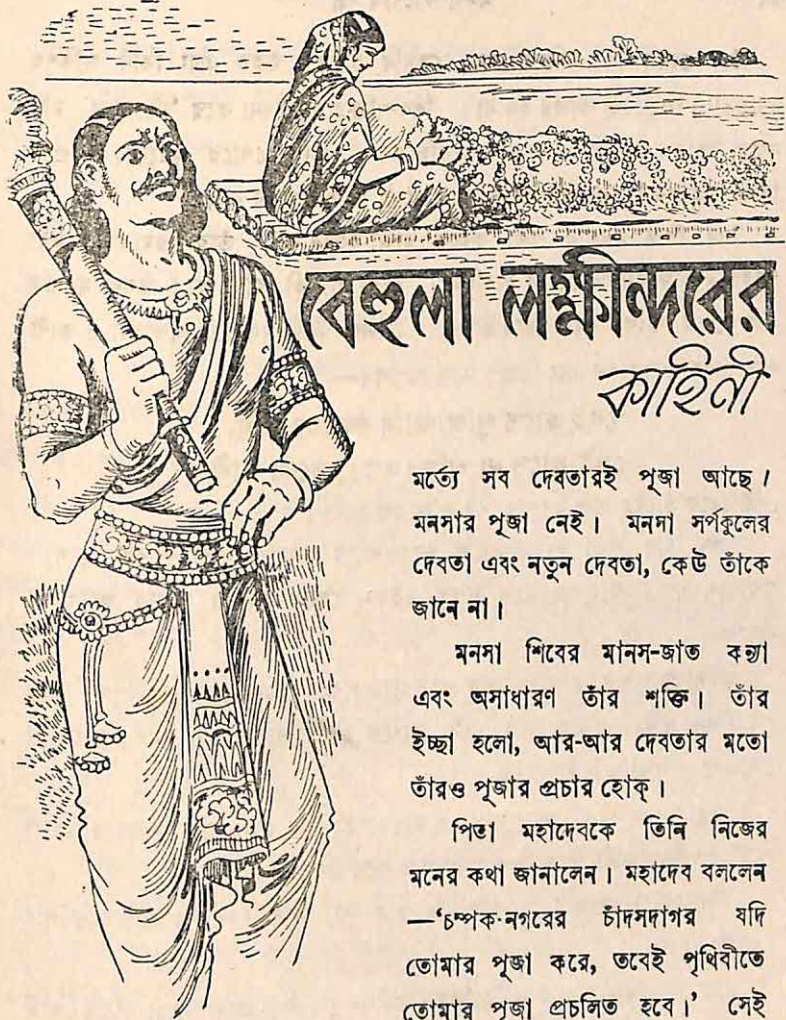
বেহুলা লক্ষীন্দরের কাহিনী

মর্ত্যে সব দেবতারই পূজা আছে। মনসার পূজা নেই। মনসা সর্পকুলের দেবতা এবং নতুন দেবতা, কেউ তাঁকে জানে না।

মনসা শিবের মানস-জাত কন্যা এবং অসাধারণ তাঁর শক্তি। তাঁর ইচ্ছা হলো, আর-আর দেবতার মতো তাঁরও পূজার প্রচার হোক্।

পিতা মহাদেবকে তিনি নিজের মনের কথা জানালেন। মহাদেব বললেন —'চম্পক-নগরের চাঁদসদাগর যদি তোমার পূজা করে, তবেই পৃথিবীতে তোমার পূজা প্রচলিত হবে।' সেই থেকে চাঁদের পূজা পাবার জন্য মনসা দেবী উদ্গ্রীব হয়ে উঠলেন।

চম্পক-রাজ চাঁদের অগাধ ঐশ্বর্য, বিপুল মান-সম্ভ্রম; ধনজনেরও সীমা নেই। চাঁদ ও তাঁর স্ত্রী সনকা শিব-শক্তির উপাসক।

চাঁদ যেমন শিব-শক্তির ভক্ত, তেমনি চরিত্রও উন্নত এবং তিনি অতিশয় দৃঢ়চেতা; কিছুতেই কাতর হন না। শিব-শক্তির আরাধনা করে 'মহাজ্ঞান' মণি নামে তিনি এক মণি লাভ করেছিলেন। তার জোরে মৃতদেহেও প্রাণ দিতে পারতেন। কাজেই তিনি কোন ভয়েই কাতর হতেন না।

চাঁদ কিন্তু মনসার পূজা করতে রাজী হলেন না। তাঁর পরমারাধ্যা দেবী পার্বতীর সঙ্গে মনসার বিবাদ হয়েছিল। দেবী পার্বতী রাগ করে তখন মনসার এক চোখ কাণা করে দিয়েছিলেন। সেজন্য তিনি মনসাকে অপদেবী ও কাণী বলে উপহাস করলেন এবং বিদ্রূপ করে বললেন—

'যেই হাতে পূজি আমি শঙ্করের রাণী,
সেই হাতে না পূজিব ব্যাঙখেকো কাণী।'

সেই থেকে চাঁদের সঙ্গে মনসার বিবাদ আরম্ভ হলো।

কিন্তু চাঁদ পূজা না করলেও চম্পকনগরে মনসার পূজা আরম্ভ হলো। স্বপ্নাদেশ পেয়ে জালু ও মালু নামে দুইজন জেলে মনসার পূজার আয়োজন করলো।

মনসা ভাবলেন, এ ভাবে ক্রমে ক্রমে তাঁর পূজার প্রচার হবে এবং পূজা করে লোকজন যদি লক্ষ্মীমন্ত হয়ে ওঠে, তাহলে হয়তো প্রথমে রাণী সনকা এবং পরে চাঁদও তাঁর পূজা করতে পারেন।

কিন্তু বৃথা আশা। জালু মালুর পূজার খবর শুনে চাঁদ সাপ মারবার দারুণ অস্ত্র হেঁতালের লাঠি নিয়ে গিয়ে পূজা পণ্ড করে দিলেন।

চাঁদ ছাড়া মনসার পূজা প্রচার হবে না, তাই মনসা এ অপমানও সয়ে গেলেন।

এর কিছুদিন পর চাঁদ বাণিজ্যে গেলেন। একে একে বারো বৎসর কেটে গেল, তবুও তিনি ফিরেন না। সনকা উদ্বিগ্ন হয়ে দিন কাটান। এমন সময় একদিন তিনি স্বপ্নে আদেশ পেলেন, 'তোমার স্বামী মনসার অপমান করেছেন, যদি স্বামীর মঙ্গল চাও, মনসার পূজা দাও; তবেই—তিনি ফিরে আসবেন।'

স্বপ্ন-মত সনকা অন্তঃপুরে ঘট প্রতিষ্ঠা করে মনসার পূজা আরম্ভ করলেন।

এর কিছুদিন পরেই চাঁদ ফি:র এলেন। সনকার আনন্দের সীমা নেই। তাঁর পূজার ফলে সদাগর মনসার দয়ায় বহু ধনরত্ন নিয়ে ফিরেছেন। তিনি কায়মনোবাক্যে মনসার পূজা আরম্ভ করলেন।

যে মনসার নামই চাঁদ শুনতে পারেন না, তাঁর অন্তঃপুরেই কিনা সেই দেবীর পূজা! খবর পেয়ে—

কোপেতে আসিল চান্দ নিজ অন্তঃপুরী।
হেঁতালের বাড়ি দিয়া ঘট করে গুঁড়ি॥

পূজার ঘট তো ভাঙলেনই, তার উপর সনকা মনসার পূজা করেছেন বলে তাঁকেও চাঁদ সদাগর তিরস্কার করলেন এবং প্রায়শ্চিত্ত করবার আদেশ দিলেন।

অপমানিত হয়ে মনসা এবার আর চাঁদকে ক্ষমা করলেন না। তাঁর আদেশে নাগগণ চাঁদের নন্দনকানন তুল্য বাগান বাড়ী ছারখার করে দিল। খবর শুনে চাঁদ হেঁতাল যষ্টি নিয়ে তাড়া করলেন নাগদের, তারা প্রাণ নিয়ে পালালো। তখন মহাজ্ঞান মণির সহায়তায় চাঁদ আবার মরা গাছগুলোকে বাঁচিয়ে তুললেন। বাগান যেমন ছিল, আবার তেমনি হলো।

এমনি ভাবে মনসা নানা চেষ্টা করেন চাঁদকে জব্দ করতে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না, উল্টে নিজেই জব্দ হন। আর চাঁদেরও তাঁর প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ বেড়ে যায়।

যে 'মহাজ্ঞান' মণির জন্য চাঁদ কিছুই গ্রাহ্য করেন না, মনসা এক সুন্দরীর বেশে চাঁদকে ভুলিয়ে একদিন তা অপহরণ করে নিয়ে গেলেন।

মহাজ্ঞান হারিয়ে চাঁদ অনুতাপ করতে লাগলেন, কিন্তু মনের বল হারালেন না। তিনি দেবী চণ্ডীর শরণ নিলেন। স্বপ্নে দেবী চণ্ডীর আদেশ পেয়ে চাঁদ শঙ্খপুরের গারুড়ি ওঝা ধন্বন্তরীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেন। ধন্বন্তরী গুণী লোক; সর্পবিষের ঔষধ তার জানা।

চাঁদের মহাজ্ঞান নেই, কাজেই মনসা নিশ্চিন্ত হয়ে তাঁর সঙ্গে শত্রুতা আরম্ভ

করলেন। প্রথমেই চাঁদের ছয় পুত্রের ওপর তাঁর নজর পড়লো। পাণ্ডুনাগকে পাঠিয়ে ছয় পুত্রকে মারলেন। কিন্তু ধন্বন্তরীর মন্ত্র ও ঔষধে তারা সবাই বেঁচে উঠলো। মনসা প্রমাদ গুণলেন। তখন তিনি নেতাকে ডেকে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলেন। মনসা বা পদ্মা যেমন শিবের কন্যা, নেতাও তাই। শিবের চোখ বা নেত্রের জল থেকে তাঁর জন্ম, তাই তাঁর নাম নেতা। দেবতা হলেও তিনি শিবের নির্দেশে স্বর্গের ধোবার কাজ করতেন। নেতা পরামর্শ দিলেন :

ওঝারে মারিতে দেবী আগে কর মন।
তবে সে চান্দের বংশ হইবে নিধন ॥

মনসা তখন অপরূপ সাজে মালিনীর বেশে ধন্বন্তরী ওঝার বাড়ী গিয়ে তার স্ত্রীর সঙ্গে সখিত্ব করলেন। তারপর কি ভাবে ওঝার মৃত্যু হবে সেই সন্ধানটি জেনে নিয়ে তাকে বধ করলেন।

এবার সত্যিই চাঁদের বিপদের দিন ঘনিয়ে এলো। মনসা একে একে চাঁদের ছয় পুত্রকে শেষ করলেন। সনকার হাহাকার আর বিধবা পুত্রবধূদের বিলাপে চম্পকনগরীর আকাশ-বাতাস বিষাদময় হয়ে উঠলো।

চাঁদ পুত্রশোক বুকে চেপে পুত্রগণকে 'কাণীর উচ্ছিষ্ট' বলে গাঙ্গরীর স্রোতে কলার ভেলায় ভাসিয়ে দিলেন। কিন্তু তবু মনসার পূজা করলেন না।

চাঁদ অচল অটল, নির্বিকার। কিন্তু যত কঠিনই হোক না কেন, সব সময় এত শোক তাপের মধ্যে মানুষ স্থির থাকতে পারে না। নির্জন মুহূর্তে সনকা ও বধূদের কান্নাকাটি তাঁকে দুর্বল করে ফেলতো; অমনি দেবী চণ্ডীকে স্মরণ করে চাঁদ আবার নিজের মনকে বাঁধতেন।

এ শোক তাপ থেকে কিছুদিনের মত দূরে থাকবার জন্য চাঁদের আবার বাণিজ্যে যাবার ইচ্ছা হলো। এ সময় তাঁর এক পুত্র জন্মালো। পুত্রের নাম রাখা হলো 'লক্ষীন্দর'।

পুত্র কোলে পেয়েও সনকার দুঃখ গেল না। মনসার কোপ এড়িয়ে লক্ষীন্দর যে বেঁচে থাকবে তাঁর সে ভরসা হলো না।

চৌদ্দ ডিঙ্গা মধুকর সাজিয়ে চাঁদ দক্ষিণ-পাটনে বাণিজ্যযাত্রা করলেন। দক্ষিণ-পাটনে যেতে হয় কালীদহের দিক দিয়ে। সেখানে মনসার এক মন্দির। মন্দিরের দিকে 'হেঁতাল' যষ্টি দেখিয়ে চাঁদ মনসাকে বিদ্রূপ করলেন।

দক্ষিণ-পাটনে গিয়ে চাঁদের বাণিজ্য খুব ভালই হলো। মূলার বদলে পেলেন হাতীর দাঁত, হরিদ্রার বদলে সোনা, আর কলাইর বদলে মুক্তা। এমনি বাণিজ্য করে ধন রত্নে চৌদ্দ ডিঙ্গা বোঝাই করে সদাগর দেশে ফিরে চললেন।

কিন্তু মনসার আক্রোশ তখনো কমেনি। কালীদহের কাছে আসতেই মনসার কোপে প্রচণ্ড ঝড় উঠলো আর ধনজন সহ চৌদ্দ ডিঙ্গা মধুকর সমুদ্রের অথৈ জলে ডুবে গেলো।

নিরাশ্রয় চাঁদ সমুদ্রের জলে ভাসতে লাগলেন। দেবতারা তখন চাঁদকে বললেন মনসার পূজা করতে—চাঁদ বললেন :

কোন জন আমারে কহিল হেন কথা।
নিকটে পাইলে তার ভাঙ্গিতাম মাথা॥

চাঁদ ডুবতে চলছেন। কিন্তু চাঁদের মৃত্যু হলে মনসার পূজা প্রচার হবে না। কাজেই মনসা

একগাছি কলাগাছ আনিল কাটিয়া।
আখর লিখিয়া গাছ দিল ভাসাইয়া॥

অকূল সমুদ্রে আশ্রয় পেয়ে চাঁদ হাত বাড়িয়ে কলাগাছ ধরলেন।

তখন অলক্ষ্যে থেকে মনসা বললেন—এখনও যদি আমার পূজা না কর তবে সমুদ্রেই তোমার মৃত্যু। এ কথা শুনে, আর কলাগাছে পদ্মার নাম দেখে কলাগাছ ছেড়ে দিয়ে আবার চাঁদ জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন।

কিন্তু চাঁদকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। তাই বাধ্য হয়ে মনসা ঢেউয়ে ঢেউয়ে চাঁদকে তীরে উঠিয়ে দিলেন।

সাতদিন চাঁদের আহার জোটেনি, ক্ষুধায় ছটফট করছেন। ভিক্ষা করে যে কয়টা চাল যোগাড় করেছিলেন, মনসা কাকরূপে তা খেয়ে গেলেন। চেয়ে-চিন্তে

একটা মাছ যোগাড় করে যখন চাঁদ নাইতে নেবেছেন, তখন চিলরূপে মনসা তা নিয়ে গেলেন। কাঠুরিয়াদের সঙ্গে চাঁদ বনে কাঠ কাটতে গেছেন, ভীমরুলের

মনসা ঢেউয়ে ঢেউয়ে চাঁদকে তীরে উঠিয়ে দিলেন। [পৃষ্ঠা ৩৫

কামড়ে যন্ত্রণা পেয়েছেন। কুমারের বাড়ী কাঠ বিক্রয় করেছেন, মনসার ছলনায় সেই কাঠ সাপ হয়ে গেলো। সেখানে

মার খেয়ে চান্দ বেনে ছটফট করে।
কিল চাপড় মারে তারে যে যত পারে ॥

এমনি ভাবে অনেক ভুগে শেষটায় চাঁদ ফিরে এলেন তাঁর নিজের বাড়ীতে।

লক্ষীন্দর তখন বড়ো হয়েছে। পুত্রমুখ দর্শনে চাঁদের সমস্ত দুঃখকষ্ট দূরে গেলো। নতুন আশায় বুক বেঁধে তিনি পুত্রের বিয়ের তোড়জোড় করতে লাগলেন।

উজানীনগরে থাকেন শাহবেনে। তাঁর কন্যা বেহুলা রূপে-গুণে অপূর্ব।

অনেক দেখে শুনে চাঁদসদাগর লক্ষ্মীন্দরের জন্য এই কন্যাই মনোনয়ন করলেন। বিয়ের আয়োজন উদ্যোগ চললো।

কিন্তু লক্ষ্মীন্দরের কোষ্ঠীর ফল দেখে চাঁদসদাগর আগেই জেনেছিলেন যে বিয়ের রাতে লক্ষ্মীন্দর সর্প-দংশনে প্রাণ হারাবেন, তাই মনসার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করতে এক
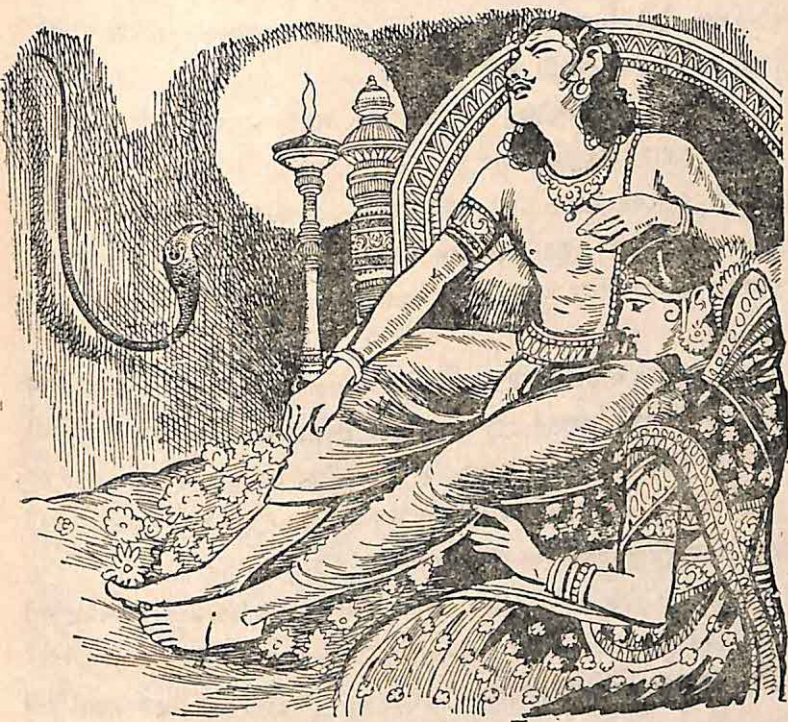
বেহুলা দেখলো—পালিয়ে যাচ্ছে কালনাগ। [পৃষ্ঠা ৩৮

লোহার বাসর তৈরি করালেন। মাছিটি পর্যন্ত ঢুকতে পারে না,—এমনি বাসর। কিন্তু মনসা স্বপ্নে ভয় দেখালেন কর্মকারকে। তাই কর্মকার লোহার বাসরের এক কোণে একটি ছিদ্র রাখলো।

বিধির নির্বন্ধ—বিয়ে হয়ে গেলো। লোহার বাসরে বর-কনে শুয়েছে, হঠাৎ কালনাগের দংশনে জেগে উঠ্‌লো লক্ষ্মীন্দর। চীৎকার ক'রে বললো :

জাগো ওগো বেহুলাগো সায়বেনের ঝি।
তোরে খাইল কাল নিদ্রা, মোরে খাইল কি ॥

চম্‌কে উঠে বেহুলা দেখলো—পালিয়ে যাচ্ছে কালনাগ। লোহার কাটারি দিয়ে বেহুলা সাপের লেজটা কেটে রাখলো।

বিয়ের বাসরেই লক্ষ্মীন্দর মনসার ক্রোধে সাপের কামড়ে প্রাণ হারালো। চতুর্দিকে কান্নার রোল উঠলো।

এই শোকের ঝড়েও স্থির রয়েছে বেহুলা—সে তার স্বামীর প্রাণ বাঁচাবেই। শ্বশুর শাশুড়ী ভাই বন্ধুর নিষেধ সে মানলো না। সে কলার ভেলায় চড়ে মৃত স্বামীকে কোলে নিয়ে গাঙ্গরীর জলে ভাসলো। স্বামীকে না নিয়ে আর ফিরে আসবে না।

যাবার সময় শাশুড়ীর কাছে চারটি চিহ্ন রেখে বললো বেহুলা, যখন সিদ্ধ ধানে অঙ্কুর হবে, তখন বুঝবেন বেহুলা দেবপুরে পৌঁছেছে,—সিদ্ধ হলুদে যখন পাতা গজাবে, তখন তার স্বামী বাঁচবে, ভাজা কড়াইয়ে যদি অঙ্কুর হয় তবে তার ছয় ভাসুর বাঁচবে, আর বিনা আগুনে যেদিন হাঁড়ির চাউল ফুটবে, সেদিন শ্বশুরের সমস্ত ধনরত্ন নিয়ে বেহুলা দেশে ফিরে আসবে।

মৃতস্বামীর দেহ কোলে নিয়ে সতী বেহুলা চলেছেন গাঙ্গরীর জলে। ভেলা এসে ঠেকলো গোদার ঘাটে। সেই ঘাটে বসে গোদা বঁড়শিতে মাছ ধরছিল। বেহুলাকে দেখে তার ইচ্ছা হলো বিয়ে করে। সে বেহুলাকে ডেকে বললো তার মনের ইচ্ছা।

বেহুলা বললো—যতদিন না আমি দেবলোক থেকে ফিরে আসি, ততদিন তোমার পায়ে এই বঁড়শি বিঁধে থাকবে।

বেহুলার ভেলা ভেসে চলেছে। যেতে যেতে ভেলা ঠেকলো গিয়ে আপু ডোমের ঘাটে। বেহুলাকে দেখে আপু ডোমের মনে লোভ জাগলো। সে ডেকে

বললো বেহুলাকে—যদি সে তাকে বিয়ে করে তবে তাকে অন্য স্ত্রীদের উপর সর্দারনী করে দেবে। বেহুলার শাপে আপু ডোম ঐখানেই অচেতন হ'য়ে পড়লো।

বেহুলার ভেলা এগিয়ে চলেছে স্বর্গের দিকে। পথে ধোনা মোনার ঘাট। দুই ভাই-ই বেহুলাকে ধরবার জন্যে নৌকা নিয়ে এগিয়ে এলো মাঝ-নদীতে—সেখানেই তাদের নৌকা ডুবলো। নেহাত বেহুলার কৃপায় তারা প্রাণে মরলো না।

মনসার পরামর্শে নেতা এবার বাঘের রূপ ধরে এলেন মড়ার মাংস খাবার জন্যে। বেহুলা বরং নিজের শরীরের মাংস দিতে রাজী হলো তবু স্বামীকে বাঘের মুখে দিতে রাজী হলো না। সে স্বামীর গলিত দেহকে আঁকড়ে ধরে রইলো। কাজেই ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলো বাঘ।

এবার নেতা এলেন চিলের বেশ ধরে। নৌকার সঙ্গে সঙ্গে সে উড়ে উড়ে চলছে—সুযোগ পেলেই ছোঁ মেরে লক্ষীন্দরের পাঁজরের হাড় খুলে নিতে। কিন্তু বুক দিয়ে পড়ে আছে বেহুলা—সাধ্য কি চিলের যে লক্ষীন্দরের দেহ স্পর্শ করে!

যেতে যেতে বেহুলা গিয়ে পৌছালো নেতা ধোপানীর ঘাটে। সেখানে স্বামীর গলিত শব ধুয়ে পাঁজরাগুলি লুকিয়ে রাখলো।

বেহুলাকে এতদিন ধরে নানাভাবে পরীক্ষা ক'রে তার একাগ্রতা দেখে নেতা মুগ্ধ হয়েছিলেন। তার দুঃখ দেখে নেতার এবার দয়া হলো।

নেতা উপদেশ দিলেন—মহাদেবকে নাচে খুশী ক'রে স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা
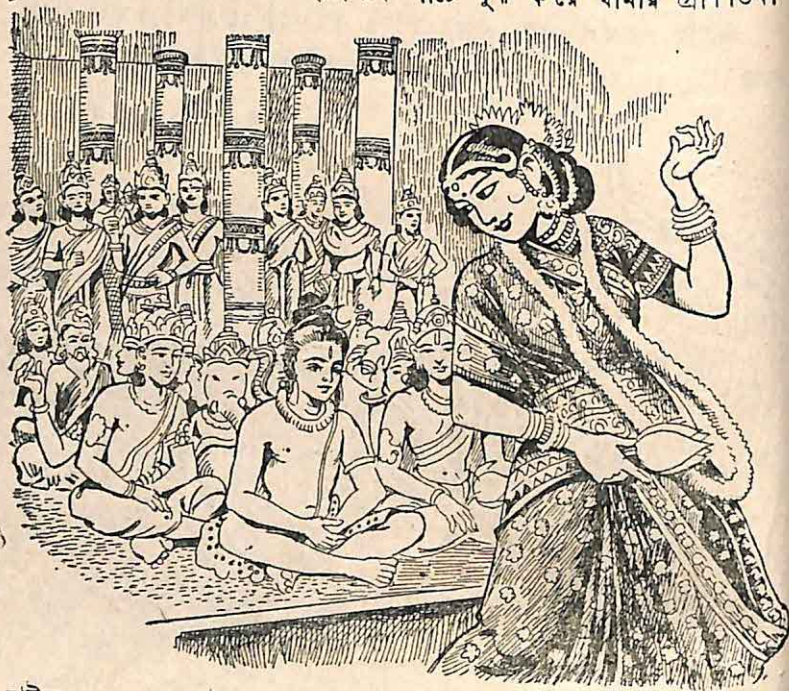
চাইতে। বেহুলা তাই করলো দেবতাদের সভায় সে নাচলো—সেই নাচে মুগ্ধ হলেন তেত্রিশকোটি দেবতা, মুগ্ধ হলেন মহাদেব স্বয়ং।

মহাদেব বললেন—বর চাও।

কি বর চাইবে বেহুলা—তার জীবনের একমাত্র কাম্য তার স্বামীর জীবন। সে স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা চাইলো।

কিন্তু মনসা ছাড়া কে লক্ষীন্দরের প্রাণ বাঁচাবে ? মহাদেবের আদেশে মনসা লক্ষীন্দরের প্রাণ বাঁচাতে রাজী হলেন, কিন্তু সর্ত রইলো, বেহুলা চাঁদসদাগরকে দিয়ে মনসার পূজা করাবে। বেহুলা প্রতিজ্ঞা করলো—সে মর্ত্যে মনসার পূজা প্রচার করবে।

দেবীর প্রসাদে লক্ষীন্দর প্রাণ পেলো। চাঁদের ছয়পুত্রও বেঁচে উঠলো। চৌদ্দ ডিঙ্গা ভেসে উঠলো সমুদ্রের বুকে। বেহুলার কোন অভাব নেই আর আজ—সে হারানো সকল ধন ফিরে পেয়েছে, সব সে আজ ফিরিয়ে দিতে পারবে তার সব-হারা শ্বশুরকে।

যে পথ ধরে বেহুলা দেবপুরে গিয়েছিলো, সেই পথ ধরেই সে ফিরে এলো দেশে। পথে পথে সবাইকে শাপমুক্ত করলো—মনের আনন্দে সকলের অপরাধই সে ক্ষমা করলো।

চাঁদসদাগরের মনে আর আনন্দ ধরে না। সতী নারী বেহুলা মনসার ক্রোধকে পরাজিত ক'রে তাঁর সমস্ত উদ্ধার করেছে। তিনি ফিরে পেয়েছেন তাঁর সাতপুত্র আর চৌদ্দডিঙ্গা মধুকর।

কিন্তু একমুহূর্তে মাত্র—তারপরই চাঁদসদাগরের সমস্ত আনন্দ দূর হয়ে গেলো। তিনি শুনলেন যে তাঁকে মনসার পূজা করতে হবে। আবার বেঁকে বসলেন চাঁদসদাগর। অবশেষে সাত পুত্রবধূ ও সনকার চোখের জল আর আত্মীয়-স্বজনদের দোহাই মেনে তিনি রাজী হলেন মনসাকে পূজা করতে। কিন্তু তাঁর প্রতিজ্ঞা ঠিক থাকলো। বাম হাতেই তিনি মনসার পায়ে ফুল-জল দিলেন।

মনসা সন্তুষ্ট হলেন। মর্ত্যে তাঁর পূজা প্রচারিত হলো।

স্বর্গের দম্পতি অনিরুদ্ধ-উষা মনসার পূজা প্রচারের জন্য লক্ষীন্দর আর বেহুলার বেশে মর্ত্যে এসেছিলেন। শাপ শেষে আবার তাঁরা স্বর্গে চলে গেলেন।

সত্যনারায়ণের কাহিনী

চন্দনা নগরে জয়াধর নামে এক বণিক ছিলেন। তাঁর তিনপুত্র—কামদেব, মদন ও সুন্দর। জয়াধর মৃত্যুর পূর্বে বড় দুই ছেলেকে ডেকে বললেন সুন্দরের যত্ন-আত্তি করতে। পিতার উপদেশ মতো তারা যথাসম্ভব যত্ন আদর করেই সুন্দরকে পালন করছিল। কিন্তু বাড়ীতে বসে থাকলে চলে না, বাণিজ্যে যেতে হবে। তাই কামদেব ও মদন তাদের স্ত্রী সুমতি আর কুমতির উপর সুন্দরের দেখাশোনার ভার দিয়ে বাণিজ্যে যাত্রা করলো।

এখন সুমতি আর কুমতি সাধারণ মানুষ ছিল না, তারা ছিল দুই অপ্সরী। কিন্তু কামদেব আর মদন সে খবর জানতো না—তারা ওদের নিয়ে সাধারণ লোকের মতই ঘর-সংসার করতো।

দু'ভাই বিদেশে গেলে পর সুমতি আর কুমতি সুন্দরকে ঘুমে অচেতন ক'রে এক গাছে চড়ে কামরূপ চলে যেতো। গাছ উড়ে উড়ে তাদের নিয়ে যেতো,

আবার রাত শেষ হবার আগেই ফিরিয়ে নিয়ে আসতো। সুন্দর তার বিন্দু বিসর্গও টের পেতো না।

একদিন সুমতি আর কুমতি গাছে চড়ে কামরূপ চলে গেলে সত্যপীর এসে সুন্দরের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলেন। সুন্দর জেগে উঠে দেখলো তার ভাই-বৌদের কেউ ঘরে নেই। ভয়ে ভয়ে সে সারারাত জেগেই কাটালো—তারপর তারা ফিরে এলে সুন্দর জিজ্ঞেস করলো রাতে তারা কোথায় ছিলো?

সুমতি আর কুমতি সুন্দরের মুখে এ কথা শুনে ভয় পেলো। তারা ভাবলো, যদি তার ভাইয়েরা ফিরে এলে সুন্দর তাদের এ সব কথা বলে দেয়! এই ভেবে তারা মিষ্টি মুখে মিছে কথা বলে তাকে ভুলিয়ে রাখলো। আর ওদিকে তার আদর যত্নের বহরও দিলো বাড়িয়ে।

কিন্তু তারা বুঝলো, সুন্দর জীবিত থাকলে তারা নিরাপদে চলাফেরা করতে পারবে না। তখন অন্য এক ফন্দী বের করলো।

রাত্রিতে সুন্দর ঘুমিয়ে পড়লে তারা মন্ত্রবলে তাকে অচেতন করে রাখলো। তারপর নদীর পারে গিয়ে কালীর পূজা করলো। কালী তাদের পূজায় সন্তুষ্ট হয়ে বর দিতে চাইলেন। তখন তারা সুন্দরকে মেরে ফেলবার বর চেয়ে নিলো। গৃহে ফিরে তারা ঘুমন্ত সুন্দরের উপর মন্ত্র পড়ে 'ফুঁ' দিলো, আর রক্ত বমি করে সুন্দর মরে গেলো।

মরবার সময় সে বারবার জল খেতে চাইলো, কিন্তু রাক্ষসীদের মনে দয়া হ'লো না। তখন সত্যপীরের নাম মুখে নিতে নিতেই সে মারা গেলো। এরপর সুমতি আর কুমতি তার মৃতদেহকে টেনে নিয়ে জঙ্গলে ফেলে দিলো। ভাবলো শিয়াল কুকুরে তার দেহ খেয়ে ফেলবে—আর কেউ কোনদিন তার চিহ্নও খুঁজে পাবে না।

সত্যপীর কিন্তু সুন্দরের ডাক শুনতে পেয়ে তার কাছেই ছিলেন। তিনি সুমতি আর কুমতির সব কীর্তিই দেখেছেন। তারপর ওরা জঙ্গল থেকে চলে গেলেই সত্যপীর সুন্দরকে আবার বাঁচিয়ে তুললেন।

সুন্দর কিন্তু আর ঘরে ফিরে যেতে চাইলো না।

সে বললো : যতদিন বেঁচে থাকি, ততদিন আপনার সেবা করেই দিন কাটাবো। কিন্তু সত্যপীর তাকে অভয় দিয়ে বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলেন। আর বলে দিলেন, এবার যদি রাক্ষসীরা তার উপর কোন অত্যাচার করতে চায়, তবে তিনি তার সাহায্য করবেন।

সুন্দর বাড়ী ফিরে গেলো।

এদিকে সুন্দরকে বাড়ী ফিরে আসতে দেখে সুমতি আর কুমতি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলো! যাকে তারা বধ করে জঙ্গলে ফেলে রেখে এলো, সে কি করে আবার বেঁচে ফিরে এলো! কিন্তু তারা এ সমস্ত বুঝতে দিলো না সুন্দরকে। যেন তারা কিছুই জানে না, এইভাবেই দিন কাটালো। আর মনে মনে ভাবলো, কি করে তাকে আবার শেষ করে ফেলা যায়।

ঐ দিনও সুন্দর ঘুমিয়ে পড়লে পর মন্ত্র পড়ে তারা সুন্দরকে অচেতন করে তার দেহকে ছুরি দিয়ে সাত খণ্ডে ভাগ করে ফেললো। তারপর সেই সাত টুকরাকে সাত জায়গায় পুঁতে রাখলো। এইবার তারা নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী ফিরে এলো।

সত্যপীর সবই জানতে পারলেন—পরীরা জঙ্গল থেকে চলে গেলেই তিনি সুন্দরকে বাঁচিয়ে তুললেন। এবার সুন্দর আর কিছুতেই নিজের বাড়ী ফিরে যেতে চাইলো না।

সত্যপীর তখন তাকে একটা গাছ দেখিয়ে বললেন—এ গাছে বসে রাত কাটিয়ে দাও।

সুন্দর তাই করলো। আর সত্যপীরের বরে সে অদৃশ্য হয়ে বসে রইলো।

পরীরা সে রাত্রিতে মনে মনে বেশ খুশী ছিলো। তারা জানতো যে সুন্দর আর কখনো ফিরে আসতে পারে না—আর সত্যি সে ফিরে এলোও না।

ঐ রাতে কামরূপের রাজকন্যার ছিল বিয়ে—খুব ধুমধাম, কত লোক যাওয়া আসা করছে। সুমতি আর কুমতিও সেই বিয়েতে যাবে স্থির করলো।

তারা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সুন্দর যে গাছে বসেছিল, সেই গাছেই চড়ে বসলো। তারপর মন্ত্রবলে গাছকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে লাগলো। সুন্দর অদৃশ্য হয়ে সেই গাছেই বসে রইলো—সুমতি-কুমতি তাকে কিন্তু দেখতে পেলো না।

সুমতির মনে হলো, আজ যেন গাছটা একটু ভারী ভারী মনে হচ্ছে। কিন্তু কুমতির মন তখন আনন্দে মশগুল—সে ঐ নিয়ে আর মাথা ঘামাতে রাজী নয়। এদিকে গাছ উড়ে উড়ে কামরূপের রাজবাড়ীর নিকট এসে থামলো। সুমতি আর কুমতি গাছ থেকে নেমে বিয়ের আসরে গিয়ে জুটলো।

রাজকন্যা স্বয়ংবরা হবে—নানা দেশ থেকে রাজপুত্র এসেছে, যার গলায় রাজকন্যা মালা দেবে, সেই হবে তার বর।

এদিকে সত্যপীর সুন্দরকে রাজপুত্রদের মধ্যে বসে থাকতে বললেন। সুন্দর তাদের মধ্যে গিয়ে বসলো, আর তাকেই সবার চেয়ে সুন্দর মনে হলো। সত্যপীরের কৃপায় তার বেশভূষাও এমন জমকালো হলো যে, সবাই তার দিকে তাকিয়ে রইলো। কামরূপের রাজকন্যাও ছিলো সত্যপীরের ভক্ত। সত্যপীর তার কানে কানে বলে দিলেন সুন্দরের গলায় মালা দিতে। রাজকুমারী তাই করলো।

অনেক রাত্তিরে বাসর ঘরে বসে সুন্দরের মনে হলো যে শেষরাত্রিতে পরীরা তো আবার গাছে চড়ে ফিরে যাবে ; কাজেই সে যদি আগেই গিয়ে গাছে বসে না থাকে, তবে আর তার দেশে ফেরা হবে না। কথাটা মনে পড়তেই সে বিছানা ছেড়ে চুপিচুপি রাজপুরী হতে বেরিয়ে পড়লো। কেউ আর তাকে লক্ষ্য করলো না—সে এসে গাছে বসে রইলো। একটু পরেই পরীরা গাছ নিয়ে মেঘের উপর দিয়ে বন্ বন্ করে উড়ে এলো আর কয়েক মুহূর্ত মধ্যে চন্দনা নগরে ফিরে এলো।

সুমতি আর কুমতি ঘরে এসে দেখে সুন্দর কোথা থেকে আবার ফিরে এসেছে। ভয়ে তাদের বুক কেঁপে উঠলো। তারা বুঝতে পারলো—এভাবে সুন্দরকে মেরে ফেললে কিছু হবে না, সে বারে বারেই বেঁচে উঠবে। অন্য ভাবে তারা সুন্দরকে সরাতে চেষ্টা করলো।

তারা অনেক রকম তুকতাক জানতো। তাই—একটা মন্ত্রপড়া কাগজ সুন্দরের চুলে বেঁধে দিলো, সুন্দর সঙ্গে সঙ্গেই একটি কাকাতুয়ায় পরিণত হলো। তাকে আর সুন্দর বলে চিনবার কোন উপায়ই রইলো না। ওরা দুই বোনে তখন পাখীটাকে বাড়ি থেকে অনেক দূরে নিয়ে ছেড়ে দিয়ে এলো। পাখীও উড়ে চলে গেলো বহু দূরে। তারপর কতকগুলি শিকারী তাকে দেখতে পেয়ে তাড়া করলো। অনেক কষ্টে পাখীটাকে তারা পাকড়াও করলো। তারপর তাকে খুব চড়াদামে বিক্রী করবার ইচ্ছায় তারা নিয়ে গেলো সমুদ্রের ধারে।
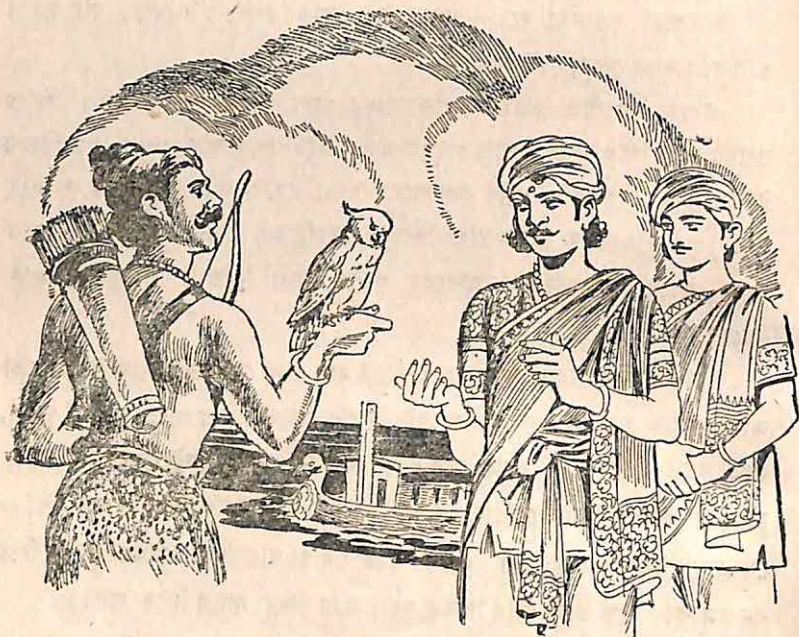
মদন ও কামদেব সেই সময় বাণিজ্য শেষ করে বহু ধনরত্ন সঙ্গে নিয়ে দেশে ফিরে আসছিল। সমুদ্রের ধারে শিকারীদের হাতে খুব সুন্দর একটা কাকাতুয়া দেখে তারা এটাকে কিনে নিলো, বাড়ী গিয়ে সুন্দরকে দেবে বলে।

ওদিকে সুন্দর যখন কামরূপের রাজবাড়ী ছেড়ে আসে, তখন তার বিছানায় ছোট একটি পত্র রেখে এসেছিল। তাতে সে রাজকুমারীকে জানিয়েছিল, যদি কোনদিন সে বিপদে পড়ে, তবে যেন চন্দনা নগরে যায়।

সকাল বেলা রাজকুমারী ঘুম থেকে উঠে দেখে, সুন্দর নেই। রাজপুরীতে মহা হৈ-চৈ পড়ে গেলো। এমন অদ্ভুত ব্যাপার সে রাজ্যে আর কখনও ঘটেনি। অনেক খোঁজাখুঁজির পর রাজকুমারীর বিছানায় সেই চিঠিটা পাওয়া গেলো। চিঠি পড়ে রাজকন্যা ভাবলো, তার চন্দনা যাওয়াই উচিত। সে রাজার নিকট বায়না ধরলো, তাকে চন্দনা পাঠিয়ে দিতে। রাজাও দেখলেন, এ ছাড়া আর গতি নেই। তিনি তখন অনেক লোক-লস্কর সঙ্গে দিয়ে রাজকন্যাকে চন্দনা পাঠিয়ে দিলেন। আর বিয়ের যৌতুক হিসাবে দিলেন প্রচুর ধনরত্ন আর মণি-মাণিক্য।

রাজকন্যা লোকজন নিয়ে চন্দনা নগরে পৌছুলো—কিন্তু সুন্দরকে আর খুঁজে পেলো না। সুমতি কুমতিও বললো যে, তারা এ সম্বন্ধে কিছুই জানে না। উল্টে তারা রাজকুমারীকে নিজের দেশে ফিরে যাবার জন্যে উপদেশ দিলো। কিন্তু রাজকন্যার এ উপদেশ ভালো লাগলো না—সে চন্দনা নগরেই রয়ে গেলো।

কিছুদিন পর মদন আর কামদেব বাড়ী ফিরে এলো। সুন্দরকে না দেখে তারা দু'-বোন্‌কে জিজ্ঞেস করলো, ব্যাপার কি? তখন তারা বানিয়ে বানিয়ে এক গল্প বললো। তারা বললো যে, দু'-ভাই বাণিজ্যে গেলে সুন্দরের চরিত্র খারাপ হয়ে যায়; সে নানা বদ্ ছেলের সঙ্গে মিশে একেবারে গোল্লায় যায়। তারপর দু'-মাস ধরে একেবারে নিরুদ্দেশ। কোথায় যে গেছে, তার আর কোন খোঁজই পাওয়া যায় না। তাদের আদরের ভাই সুন্দরের এই পরিণতির কথা শুনে ভাইয়েরা খুবই দুঃখিত হলো।

তারপর দুই বোন্ আরও বললো যে—কোত্থেকে এক যুবতী এসে নিজেকে সুন্দরের স্ত্রী বলে পরিচয় দিচ্ছে—অথচ তারা এ বিয়ের বিন্দুবিসর্গও জানে না।

পিতার মৃত্যুর পর মদন আর কামদেব এত আদর-যত্ন করে খাইয়ে-পরিয়ে যে ভাইকে মানুষ করেছে, তার এই দশা শুনে তাদের মন দুঃখে ভরে গেলো।

তবু এই দুঃখেও তারা সান্ত্বনা পেলো রাজকুমারীকে দেখে। তার রূপ ও গুণ দেখে তারা রাজকুমারীকে নিজেদের ভাই-বৌ বলেই গ্রহণ করলো। ভাইয়ের জন্যে আনা পাখীটা তারা রাজকুমারীকেই উপহার দিল।

একদিন রাজকুমারী পাখীর মাথায় আদর করে হাত বুলোচ্ছিল। হঠাৎ তার হাতে কি একটা ঠেকলো। এটা পরীদের মন্ত্রপড়া কাগজ। রাজকুমারী কাগজটা মাথা

থেকে বার করে আনতেই পাখী সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরের মূর্তি নিয়ে দাঁড়ালো।

সুন্দর তখন সব ঘটনা খুলে বললো রাজকুমারীকে। তারপর আবার বললো, তার মাথায় কাগজটা আটকে দিতে। রাজকুমারী তাই করলো—সুন্দর আবার পাখী হয়ে গেলো।

পরদিন সুন্দরের স্ত্রী মদন আর কামদেবকে তার ঘরে খাবার নেমন্তন্ন করলো। সে নিজ হাতে নানারকম ভাল ভাল খাবার জিনিস রান্না করলো।

মদন আর কামদেব খেতে এসে দেখলো—তিনটে জায়গা করা হয়েছে, অথচ তারা মাত্র দু'জন লোক।

এমন সময় সুন্দরের স্ত্রী এসে বললো :

আপনারা দু'ভাই খেতে বসেছেন—আর এক ভাই কোথায়, তাকে ডাকুন।

মদন আর কামদেব ভাবলো—সুন্দরের শোকে বুঝি তার স্ত্রীর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তারা তাই চুপ করে রইলো।

কিন্তু রাজকন্যা বারবার তাদের অনুরোধ করতে লাগলো ভাইকে ডাকতে। অগত্যা তারা সুন্দরের নাম ধরে ডাকলো। সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর এসে ভাইদের সঙ্গে খেতে বস্‌লো। তা দেখে ভাইদের আনন্দ আর বিস্ময়ের সীমা রইলো না।

তারপর ধীরে ধীরে সুন্দর বললো—সুমতি আর কুমতির কীর্তিকাহিনী।

সব কথা শুনে মদন আর কামদেব রাগে জ্বলতে লাগলো। তারা স্থির করলো এর চরম সাজা সুমতি ও কুমতিকে দিতে হবে। তখন তারা বাড়ীর মধ্যে বেশ বড় করে একটা গর্ত করলো। তারপর সুমতি আর কুমতিকে ডেকে বললো যে, চোর ডাকাতের ভয়ে তারা এই গর্তের মধ্যে সমস্ত ধনরত্ন পুঁতে রাখতে চায়।

এই কথা শুনে সুমতি আর কুমতি নেমে দেখতে এলো গর্তের কাছে। তখন দুই ভাই ধাক্কা দিয়ে তাদের গর্তে ফেলে দিলো। তারপর মাটি দিয়ে ভরাট করে দেওয়া হলো। সুমতি আর কুমতি চিরকালের মতো মাটির নীচে চাপা পড়লো।

সত্যপীরের বরে তাদের সংসারে আবার শান্তি ফিরে এলো।

সূর্য মঙ্গলের কাহিনী

এক দেশে এক দরিদ্র ব্রাহ্ম বাসণ করতেন। ব্রাহ্মণ দরিদ্র হলেও গৃহে তাঁর শান্তি বজায় ছিল। তাঁর স্ত্রী ছিলেন যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। তাঁদের ছিল দুইটি মেয়ে—রুমুনা আর ঝুমুনা।

রুমুনা ঝুমুনা বেশি বড় হবার আগেই একদিন ব্রাহ্মণের পত্নী-বিয়োগ হলো। এইবার ব্রাহ্মণ পড়লেন বিপদে। একদিকে দুটি মেয়ের রক্ষণাবেক্ষণ, আর একদিকে দারিদ্র্য তো আছেই। নিজের গৃহে অন্নের কোন সংস্থান নেই যে, বাড়ীতে থেকে মেয়েদের দেখাশোনা করবেন।

দিনান্তে যদি পেটে কিছু না পড়ে, তবে জীবন চলা ভার। তাই উদরান্নের সংস্থানে ব্রাহ্মণকে রোজই ভিক্ষায় বেরুতে হয়।

একদিন ব্রাহ্মণ ভিক্ষায় বেরিয়েছেন, তখন মেয়ে দুটিও বেরুলো বন থেকে শাক তুলে আনবার জন্যে। গরীবের ঘর—সবাই মিলে কাজকর্ম না করলে চলবে কেন? তাই মেয়ে দুটিও চেষ্টা করে,—দরিদ্র পিতাকে যতখানি সাহায্য করতে পারে।

রুমুনা ঝুমুনা গেলো বনে। সেখানে গিয়ে যা দেখলো, তাতে তাদের চোখ ঝলসে গেলো। সারা বন আলোকিত করে সেখানে বসে পূজা করছেন কয়েকজন দেবকন্যা। এত রূপ তাঁদের যে, রূপের দিকে তাকানোই যায় না।

রুমুনা ঝুমুনা দুই বোন্ অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইলো দেবকন্যাদের দিকে। দেবকন্যারা সেখানে ধীরে-সুস্থে কতক্ষণ ধরে সূর্যপূজা করলেন। পূজা-অন্তে দেবকন্যারা যথাস্থানে চলে গেলেন।

দেবকন্যাদের এইভাবে সূর্যপূজা করতে দেখে রুমুনা ঝুমুনারও ইচ্ছে হলো—তারা সূর্যপূজা করবে। দেবকন্যারা যে ভাবে সূর্যপূজা করছিলেন, বো'ন্ দু'টি তা বেশ ভালভাবেই লক্ষ্য করেছিল। তারাও বনে বসে ভক্তিভরে করলো সূর্যপূজা। তারপর ফিরে এলো বাড়ীতে।

বাড়ীতে এসে তো তারা অবাক্। তারা যখন বনে বসে সূর্যপূজা করছে, তখন সূর্যদেব সন্তুষ্ট হয়ে তাদের বাড়ী ধনে-রত্নে পূর্ণ করে দিয়েছিলেন। তারা বাড়ীতে এসে সব ঐশ্বর্য দেখে প্রথমে তো তাকে নিজেদের বাড়ী বলেই চিনতে পারেনি।

তারপর সূর্যের কৃপায় তাদের দুঃখ দূর হয়েছে বলে তারা বাড়ীতে সূর্যের ঘট স্থাপন করে নিত্য নিত্য সূর্যপূজা করতে লাগলো।

সে দেশের রাজার ছিল এক কন্যা। সেই কন্যা দিনে দিনে বড় হয়ে ক্রমে বিবাহযোগ্যা হলো। কিন্তু পাত্র জোটে না তার। রাজা বহু চেষ্টা করলেন কিন্তু মেয়ের যোগ্য বর জোটানো ভার হলো। শেষটায় রাজা চটেমটে স্থির করলেন—পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথম যার মুখ দেখবেন, তারই হাতে দেবেন মেয়েকে তুলে।

রোজকার মতন ঐ দিনও ব্রাহ্মণ ভোরে উঠে নিত্যকর্ম সেরে বেরুলেন ভিক্ষার সন্ধানে। তিনি যখন রাজবাড়ীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন—ঠিক সেই সময় রাজার ঘুম ভাঙ্গলো। তিনি শয্যা ত্যাগ করে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন, এমন সময় দেখতে পেলেন সেই ব্রাহ্মণকে।

তারপর প্রতিজ্ঞামত রাজা ঐ ব্রাহ্মণের হাতেই কন্যা দান করলেন।

ব্রাহ্মণ রাজকন্যাকে বিয়ে করে যথাকালে তাকে নিয়ে এলেন নিজের বাড়ীতে। এতদিন ধরে ব্রাহ্মণের গৃহে তার মেয়েরাই ছিল কর্ত্রী, কিন্তু এখন রাজকন্যা এসেই নিজ হাতে তুলে নিলেন সংসারের ভার।

রাজকন্যা দেখতে পেলেন—তাঁর সতীনকন্যা রুমুনা ঝুমুনা রোজ রোজ সূর্যপূজা করে। রাজকন্যার এটি ভাল লাগলো না। তাছাড়া সতীনকন্যাদের উপর তাঁর বিদ্বেষভাব ক্রমেই বেড়ে উঠছিল। শেষপর্যন্ত আর তাদের সইতে না পেরে রাজকন্যা ব্রাহ্মণকে ধরে বসলেন যে রুমুনা ঝুমুনাকে বনবাসে পাঠাতে হবে।

ব্রাহ্মণও রাজকন্যার অনুরোধ ঠেলতে পারলেন না। তিনি স্থির করলেন—দুই কন্যাকে বনেই পাঠাবেন। কিন্তু বনে পাঠানোর কথা তো আর তাদের জানানো যায় না। তাই তিনি কন্যাদের বললেন:

'চল, তোমাদের মাসীর বাড়ী যাবে।' রুমুনা ঝুমুনা তো আর এত কথা জানে না। তারা মাসীর বাড়ী যাবে শুনে তো খুবই খুশী। সেজেগুজে তারা একদিন বাপের সঙ্গে চললো মাসীর বাড়ী।

বনের মধ্য দিয়ে পথ—সেই পথে রুমুনা ঝুমুনা তাদের বাপের সঙ্গে চলেছে মাসীর বাড়ী। অনেকখানি পথ চলবার পর তারা ক্লান্ত হয়ে একটা গাছের নীচে বসে পড়লো বিশ্রাম করতে। ক্রমে তারা দুই বোন্ গাছের নীচেই ঘুমিয়ে পড়লো।

ব্রাহ্মণ যখন দেখলেন মেয়েরা বনের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন তাদের সেখানে রেখেই বাড়ীতে ফিরে গেলেন।

ব্রাহ্মণ চলে যাবার পর মেয়েদের ঘুম ভাঙ্গলো। কিন্তু তারা বাপকে দেখতে না পেয়ে কান্নাকাটি করতে লাগলো। বেচারীরা তো আর জানে না যে তাদের বাবা সৎমায়ের কথায় তাদের বনে নির্বাসন দিয়ে গেছেন।

এদিকে বেলা বেড়ে গেছে অনেকটা। তাই দেখে তারা ভাবলো,—এখন স্নান করা দরকার। বনের মধ্যেই তারা দেখলো এক পুকুর। পুকুরে নাইতে নেমে জলের মধ্যে তারা পেলো এক কলসী। কলসীটা জল থেকে তুলে দেখে—সোনার তৈরী সেই কলসী। তখন কলসী কাঁখে নিয়ে দুই বোন্ চললো বাড়ীর দিকে। মাসীর বাড়ী তো তারা চেনে না।

তারা এসে বাড়ী পৌঁছালো—কিন্তু তাদের দেখে সৎমা ভীষণ চটে গেলেন। তাদের অনেক গালমন্দ করলেন। কাজেই তারা আবার বনেই ফিরে গেলো।

রুমুনা ঝুমুনা ছিল সূর্যের ভক্ত—তাই তাদের দুঃখ দেখে সূর্যের দয়া হলো।
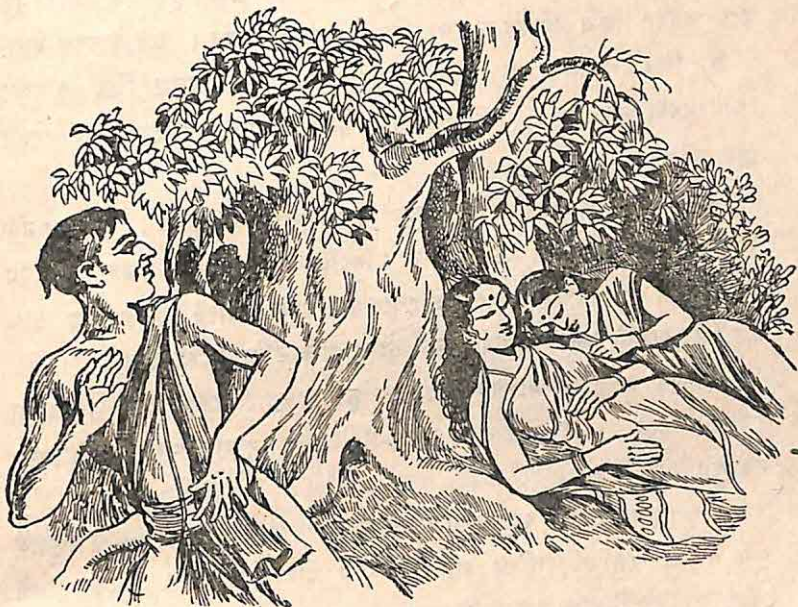
মেয়েরা বনের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে দেখে ব্রাহ্মণ বাড়ী ফিরে গেলেন। [পৃষ্ঠা ৫২

সূর্যঠাকুর তাদের জন্যে বনের মধ্যেই একটা টং তৈরী করে দিলেন—রুমুনা ঝুমুনা সেই টং-এর মধ্যেই থাকতে লাগলো।

বেশ কিছুকাল চলে গেছে।…

পার্বতীপুরের রাজা অনঙ্গশেখর। একদিন অনঙ্গশেখর বেরুলেন মৃগয়ায়। ঘুরতে ঘুরতে তিনি চলে এলেন এই বনে—যে বনে ছিল রুমুনা ঝুমুনা। রোদে রোদে ঘুরে রাজা অনঙ্গশেখর ভয়ানক তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠলেন—কিন্তু কোথাও জলের সন্ধান পেলেন না।

শেষ পর্যন্ত রাজা দেখলেন একটা টং—তিনি এগিয়ে গেলেন সেই দিকে। তারপর সেখানে জল খেয়ে শুধু তৃষ্ণাই দূর করলেন না—রুমুনা ঝুমুনাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তাদের তিনি নিজের রাজ্যে নিয়ে যাবেন, ভাবলেন। এই উদ্দেশ্যে রাজা নিজে বিয়ে করলেন বড় বোন্ রুমুনাকে আর কোটালপুত্র বিয়ে করলেন ছোট বোন্ ঝুমুনাকে। তারপর তাঁরা দুই জন দুই বোন্‌কে নিয়ে এলেন রাজধানীতে।

রুমুনা আছে রাজবাড়ীতে আর ঝুমুনা আছে কোটাল-বাড়ীতে। দুই বোন্‌ই যার যার বাড়ীতে সূর্যের ঘট স্থাপন করে নিয়মিত ভাবে সূর্যপূজা করত। সূর্যের কৃপায় তারা নানা বিপদে পড়েও রক্ষা পেয়েছে—সূর্যের কৃপায়ই তাদের এত ভাল ঘরে বিয়ে হলো। তাই সুখের দিনেও সূর্যের প্রতি ভক্তি তাদের কমেনি।

একদিন রাজা অনঙ্গশেখর অন্তঃপুরে ঢুকেছেন, দেখতে পেলেন রাণী রুমুনা সূর্যপূজা করছে। এই দেখে রাজা রাগে লাথি মেরে পূজার আয়োজন উপকরণ সব দূরে ফেলে দিলেন।

ফলে সূর্যের ক্রোধে রাজার রাজ্য নষ্ট হলো। রাজা ভাবলেন—রাণী রুমুনাই বুঝি অপয়া—সে রাজবাড়ীতে আসায়ই বুঝি রাজার রাজ্যনাশ হয়েছে। এই ভেবে রাজা কোটালকে আদেশ দিলেন :

'রাণীকে কেটে তার রক্ত এনে দেখাবে।'

কিন্তু কোটাল সত্যি সত্যি রাণীকে কাটলো না। সে এক শিয়ালকে কেটে তার রক্ত এনে দেখালো রাজাকে। আর রাণীকে ছেড়ে দিয়ে এলো বনের মধ্যে। রাণী ছিল গর্ভবতী—সেখানেই তার এক ছেলে হলো—ছেলের নাম রাখা হলো দুঃখরাজ।

এদিকে কোটালেরও হলো এক ছেলে—তার নাম রাখা হলো সুখরাজ।

দুঃখরাজ থাকে বনে—তার মায়ের সঙ্গে। সূর্যের কৃপায় দুঃখরাজ নানা অস্ত্রেশস্ত্রে নিপুণ হয়ে উঠলো।

একদিন আকাশে উড়ে যাচ্ছে এক পাখী—দুঃখরাজ তাকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়লো। সেই পাখীটি কিন্তু আসলে পাখী ছিল না—সূর্যদেব নিজেই পাখীর বেশে এসেছিলেন। পাখীটি দুঃখরাজকে লক্ষ্য করে বললো :

'নিজের বাবার নাম জানো না—তোমার আবার পরিচয় কি ?'

পাখীর কথায় দুঃখরাজের মনে বড় দুঃখ হলো। সে ফিরে এলো নিজের বাড়ীতে ; এসে মাকে বললো সব কাহিনী।

তখন রুমুনা ছেলেকে বললো তার বাবার কথা। দুঃখরাজ যে রাজার ছেলে, সেই খবর শুনে তার দুঃখ দূর হলো।

তারপর একদিন গেলো সে তার মাসীর বাড়ীতে। দুঃখরাজ সেখানে গিয়ে রইলো কিছুদিন। তারপর মাসীর বাড়ী থেকে প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে ফিরে এলো বাড়ীর দিকে। পথে সূর্য ব্রাহ্মণের বেশে দুঃখরাজের হাত থেকে ধনরত্ন সব কেড়ে নিলেন। শূন্য হাতে দুঃখরাজ ফিরে এলো নিজের বাড়ীতে।

কিছুদিন পর রুমুনা দুঃখরাজকে সঙ্গে নিয়ে গেলো কোটালের বাড়ী। বহুদিন পর দুই বোনে দেখা হলো। তারপর দুইজন এক সঙ্গে বসে করলো সূর্যপূজা!

সূর্যদেব সন্তুষ্ট হলেন রুমুনার উপর। রুমুনার দুর্ভাগ্য দূর হলো।

সূর্যের কৃপায় এতদিন পর রাজা অনঙ্গশেখরের মনেও জাগলো রাণী রুমুনার কথা। তিনি কোটালকে ডেকে বললেন, যেখান থেকে পারো, রাণীকে ফিরিয়ে আনো। যদি আনতে না পারো, তবে তোমার গর্দান যাবে।

কোটাল কোন কথা না বলে ফিরে এলো বাড়ীতে তারপর ঝুমুনার সঙ্গে পরামর্শ করে রাজাকে নিমন্ত্রণ করলো।

রাজা খেতে এলেন কোটালের বাড়ীতে। তিনি খেতে বসেছেন—পরিবেশন করছেন রাণী রুমুনা।

এতক্ষণে রাজা রাণীকে চিনতে পারলেন, তারপর সন্তুষ্ট চিত্তে রাণী রুমুনা আর পুত্র দুঃখরাজকে সঙ্গে নিয়ে চললেন বাড়ীর দিকে।

পথে এক অমঙ্গল দেখে রাজা রেগে গিয়ে এক হাড়ির সাতপুত্রকে হত্যা করলেন। হাড়ির পত্নী তখন পুত্রশোকে চীৎকার করে কাঁদতে লাগলো। তার

সূর্যের প্রতাপ দেখে রাজাও সূর্যপূজা করলেন। [পৃষ্ঠা ৫৭

কাতর ক্রন্দনে রাণীর মনে জাগলো দুঃখ। তিনি হাড়ির পত্নীকে ডাকিয়ে এনে তাকে নিয়ে সূর্যপূজা করলেন। সূর্যদেবতা তুষ্ট হয়ে হাড়ির সাতপুত্রকে দিলেন বাঁচিয়ে।

রাজা নিজের চোখে দেখলেন সূর্যের প্রতাপ। তখন তাঁর সূর্যের প্রতি আর কোন বিদ্বেষ রইলো না—তিনি মহাসমারোহে সূর্যপূজা করলেন। এই পুণ্যের প্রভাবে রাজা পিতৃপুরুষদের দর্শনলাভ করলেন।

তারপর অন্তিমে পুত্রের হাতে রাজ্যভার সঁপে দিয়ে রাজা অনঙ্গশেখর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে সূর্যলোকে স্থান পেলেন।

দেবাদিদেব মহাদেব বিয়ে করেছেন দক্ষ প্রজাপতির কন্যা সতীকে। সেই সম্পর্কে ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ হলেন শিবের শ্বশুর।

একদিন দেবসভায় সমস্ত দেবতারা বসে আছেন, এমন সময় সেখানে এসে উপস্থিত হলেন দক্ষ প্রজাপতি। মহাদেব দেবতাদের গুরুজন, আবার তাঁরও গুরুজন দক্ষ—কাজেই দক্ষের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্যে দেবতারা সব উঠে দাঁড়ালেন। উঠলেন না শুধু মহাদেব। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন যে তিনি দেবাদিদেব—যাঁর আদি নেই অন্ত নেই, তাঁর আবার গুরুজন কে? কিংবা হয়তো ভোলানাথের এত খেয়ালই ছিল না। কিন্তু তাহলে কি হবে—শ্বশুরের মানের নাড়ী টনটনে— তিনি চটে গেলেন মহাদেবের উপর।

দক্ষ উঠে পড়ে লাগলেন—কি ভাবে এই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া যায়,

তারই চিন্তায়। তারপর স্থির করলেন তিনি এক যজ্ঞ করবেন—বিরাট যজ্ঞ, তাতে ত্রিভুবনের সবাইকে নেমন্তন্ন করবেন—বাদ দেবেন শুধু মহাদেবকে : তাহলেই অপমানের উপযুক্ত প্রতিশোধ নেওয়া হবে।

দেবতারা যখন শুনলেন যে দক্ষ শিবহীন যজ্ঞ করছেন, তখন তাঁরা ভয় পেলেন—কারণ শিবহীন যজ্ঞের কথা যে কল্পনাই করা যায় না। তবু দক্ষ যজ্ঞের আয়োজন সম্পূর্ণ করেছেন—সবাই উপস্থিত হয়েছেন—যজ্ঞ আরম্ভ হয়েছে।

যেখানে যত কোন্দল, সেখানেই থাকেন নারদ মুনি—এখানেও হলো তাই। তিনি দক্ষের যজ্ঞ করবার কথা গিয়ে লাগালেন কৈলাসে সতীর নিকট। আরও বললেন যে দক্ষের অন্য কন্যারা সবাই সেখানে গেছেন, বিশ্বের সবাই গেছে—শুধু তাঁরাই বাদ।

স্বামীর এ রকম অপমান শুনে সতী ঠিক করলেন তিনি সেখানে যাবেনই। মনে মনে হয়তো তিনি ভেবেছিলেন যে পিতাকে একটু মিষ্টি মুখে বললেই তিনি শিবকে নিমন্ত্রণ করবেন।

শিব কিন্তু বিনা নিমন্ত্রণে সতীকে বাপের বাড়ী যেতে নিষেধ করলেন। অথচ সতী যাবেনই—অটল তাঁর প্রতিজ্ঞা। তখন বাধ্য হয়ে মহাদেব তাঁকে যেতে অনুমতি দিলেন—সতী পিতৃগৃহে চললেন, সঙ্গে চললো নন্দী ভৃঙ্গী।

সতী গিয়ে যখন যজ্ঞস্থলে পৌছুলেন, তখন দক্ষ দেবতাদের সামনে বসে শিবনিন্দা করছেন। সতীকে দেখে তাঁর মুখে যেন শিবনিন্দার তুবড়ি ছুটলো। তিনি কদর্য ভাষায় শিবকে গালি দিতে লাগলেন। সতী অনুরোধ করলেন তাঁর বাবাকে —শিবনিন্দা ছেড়ে শিবকে যজ্ঞের ভাগ দিতে, কিন্তু সে কথা তিনি আমলেই আনলেন না। সতীনারী কখনও পতিনিন্দা সহ্য করতে পারে না—ফলে যজ্ঞস্থলেই সতী দেহত্যাগ করলেন।

নন্দীর মুখে সে খবর পেয়ে মহাদেব রুদ্ররূপে যজ্ঞ পণ্ড করলেন। শিবের অনুচরগণ দক্ষের মুণ্ড কেটে ফেললো—পরে সেখানে একটা ছাগের মুণ্ড

লাগিলে দেওয়া হলো। দক্ষ হলেন ছাগমুণ্ড। দক্ষের সাজানো রাজসংসার শ্মশানে পরিণত হলো।

মহাদেব বিবাগী হয়ে পাগলের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

এদিকে সতী দেহত্যাগ করে পরজন্মে হলেন হিমালয় আর মেনকার কন্যা—নাম গৌরী। একেবারে শিশুকাল থেকেই তিনি শিবকে পতিরূপে কামনা করতেন। যত বড় হতে লাগলেন ততই তাঁর কামনা আরও গভীর হতে লাগলো। মহাদেবেকে পতিরূপে লাভ করবার জন্যে গৌরী কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন। মহাদেব গৌরীর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বিয়ে করলেন—হরগৌরীর মিলন হলো।

ত্রিলোকের অধিপতি হলে কি হবে—মহাদেব কিন্তু একেবারে কাঙ্গাল। ঘর-সংসারে মন নেই—যেথানে খুশী ঘুরে বেড়ান, ভিক্ষা করেন, যা খুদ-কুঁড়া জুটি পান, তাতেই তাঁদের দিন চলে যায়।

কিন্তু এ দেখে গৌরীর মনে সুখ নেই। তিনি নিজে হিমালয় রাজার কন্যা—আর বিশ্বেশ্বরের পত্নী—এত দুর্দশা তাঁর ভাল লাগবে কেন? তিনি মহাদেবকে অনুরোধ করলেন সংসারের দিকে মন দিতে।

মহাদেবের কিন্তু এ সমস্ত ভাল লাগে না। কে কোথায় তাঁর ভক্ত দুঃখে দিন কাটাচ্ছে—তার দুঃখ মোচনের দিকেই তাঁর যত দৃষ্টি।

এদিকে গৌরী আর দিন কাটাতে পারছেন না—ঘরে পুঁজিপাতি যা ছিল, তাও সব শেষ হয়ে এলো—ভিক্ষায়ও চলবে না। তখন গৌরী পরামর্শ দিলেন মহাদেবকে চাষবাস করবার জন্যে। কিন্তু চাষের ফল কি হবে, তা কৃষক ভাবতেও পারে না—তাই চাষে মহাদেবের আপত্তি। সময়মত রোদবৃষ্টি না পেলে সব খাটুনি বিফল যাবে। কাজেই মহাদেব ভাবলেন, যদি কিছু করতেই হয়, তবে চাষ না করে ব্যবসা করাই উচিত। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মনে হলো, ব্যবসা করতে তো পুঁজিপাটার দরকার হয়। ভিক্ষায় তাঁর দিন চলে, তিনি পুঁজি পাবেন কোথায়?

অগত্যা মহাদেব পৃথিবীতে গিয়ে চাষবাসই করবেন, ঠিক হলো। দেবরাজের নিকট থেকে তিনি চাষের জমি পাট্টা করলেন। বিশ্বকর্মা চাষের জন্য লাঙল, মই, জোয়াল তৈরি করে দিলেন। কিন্তু বীজধান পাওয়া যাবে কোথায়? মহাদেব নিজে গিয়ে কুবেরের ভাণ্ডার থেকে বীজধান ধার করে আনলেন।

মাঘের শেষে জোর বৃষ্টি হলো। মহাদেবের অনুচর ভীম জমিতে হাল দিল—পৃথিবী শস্যসম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। নারদমুনির ঢেঁকি দিয়ে ভীম ধান ভানলো—শিবের সংসার আনন্দে পূর্ণ হলো।

মহাদেব তো মাটির মায়ায়ই আচ্ছন্ন হয়ে আছেন—কৈলাসে যাবার কোন ইচ্ছাই নেই। অথচ গৌরীর ইচ্ছা মহাদেব কৈলাসে আসেন। পার্বতী তখন নারদের শরণাপন্ন হলেন। নারদ পরামর্শ দিলেন—পৃথিবীতে মশা-মাছি ছেড়ে দেওয়া হোক্।

পার্বতীর আদেশে মশা, ডাঁশ আর মাছিতে পৃথিবী ছেয়ে গেলো। তাদের কামড়ের জ্বালায় মহাদেব অস্থির হয়ে উঠলেন—কিন্তু তবু তিনি পৃথিবী ছাড়লেন না। তখন সমস্ত শরীরে ঘি মেখে তিনি তাদের কামড় এড়াতে চাইলেন। এমনি ভাবে মাটির মায়ায় মহাদেব কৈলাসকে ভুলে মাটির বুকেই রয়ে গেলেন—নারদের পরামর্শ ব্যর্থ হলো।

পার্বতী শেষ পর্যন্ত একদিন বাগ্‌দিনীর রূপ নিয়ে দেখা দিলেন মহাদেবের চাষের জমিতে। মহাদেব কিন্তু তাঁকে চিনতে পারেননি। পার্বতী বাগ্‌দিনীর বেশেই জমিতে মাছ ধরছেন, ধান ভেনে দিচ্ছেন। শিব তাঁকে দেখে মুগ্ধ হয়ে বিয়ে করতে চাইলেন। পার্বতী বললেন, যদি তাঁকে মহাদেব বিয়ে করেন, তবে বাগ্‌দীদের মতো তাঁকেও জল সেঁচতে হবে, মাছ ধরতে হবে। মহাদেব তাতেই রাজী—তিনি বাগ্‌দিনীকে সাহায্য করছেন।

বাগ্‌দিনী মহাদেবের নিকট থেকে প্রেমের চিহ্ন স্বরূপ তাঁর হাতের পিতলের আংটিটি চেয়ে নিলেন। তারপর চলে গেলেন কৈলাসে।

এদিকে মহাদেবও বৃষারোহণে কৈলাসে গিয়েছেন—তিনি যখন ঘরে ঢুকবেন, তখন পার্বতী বাধা দিয়ে বললেন যে মহাদেব জাত খুইয়ে এসেছেন পৃথিবী থেকে। বাগ্‌দিনীর প্রেমে মজে তিনি তাঁর আংটি পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছেন। এ সমস্ত কথা শুনে মহাদেব তো মহা অপ্রস্তুত, অবাক্‌ও হলেন যথেষ্ট।

মান অভিমানের পালা চুকলে নারদের পরামর্শে একদিন দেবী মহাদেবকে
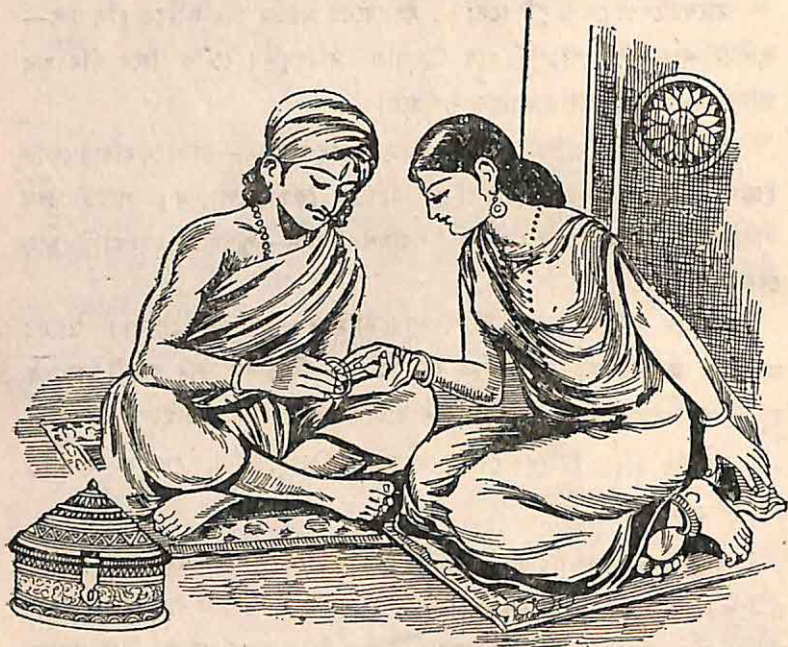
বললেন তাকে শাঁখা পরাতে। কিন্তু মহাদেব নিঃস্ব—শাঁখা কিনবেন কি দিয়ে। শাঁখা পরানো হলো না।

অভিমানে পার্বতী বাপের বাড়ী চললেন—সেখানে উৎসব, চারিদিকে শুধুই আনন্দ। তারি মধ্যে পার্বতীর দিন যাচ্ছে।

এদিকে নারদের পরামর্শে মহাদেব নিজে শাঁখারির বেশ ধরে গেলেন হিমালয়-রাজ্যে। শাঁখা দেখে পার্বতী মুগ্ধ। মহাদেবের ছলনাও তিনি ধরে ফেলেছেন। কিন্তু তবু তা' মুখে ভাঙছেন না।

শঙ্খের মূল্য জিজ্ঞাসা করলে মহাদেব বললেন যে একমাত্র শাঁখারির হাতে নিজেকে সঁপে দিলেই শাঁখারি তাঁকে শাঁখা পরিয়ে দেবেন। পার্বতী কৌতুক করে বললেন, পরনারীর প্রতি লোভ করা অন্যায়। এমনি ভাবে কিছুক্ষণ চললো কপট ঝগড়া। শেষ পর্যন্ত মহাদেব পার্বতীর হাতে শাঁখা পরিয়ে দিলেন। হরগৌরীর মিলন হলো, তাঁরা আবার কৈলাসে ফিরে গেলেন।

—শেষ—

জনশিক্ষা গ্রন্থমালা

১। মহাভারতীয় গল্প
২। পুরাণের গল্প
৩। পল্লীগীতি-কাব্য-কথা
৪। জাতকের গল্প
৫। উপনিষদের গল্প
৬। ভাগবতের গল্প
৭। ভারত নারী
৮ মঙ্গলকাব্যের কথা
৯। জ্ঞানে ও কর্ম্মে বাঙ্গালী
১০। সাহিত্যে বাঙ্গালী
১১। রামায়ণী কথা
১২। ধর্ম্মে বাঙ্গালী
১৩। দেশপ্রেমে ভারতবাসী
১৪। দেবী যুদ্ধের কাহিনী
১৫। ভক্ত-জীবন কাহিনী
১৬। মহাকবি বাল্মীকি
১৭। কালিদাস কাহিনী
১৮। বাইবেলের গল্প
১৯। কালিদাসের গল্প
২০। কুমার সম্ভব
২১। পৌরাণিক কাহিনী।
২২। সেকালের রাজাদের গল্প
২৩। সংস্কৃত সাহিত্যের গল্প
২৪। বত্রিশ পুতুলের গল্প
২৫। কল্কিপুরাণের গল্প
২৬। প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্য
২৭। বিল্বমঙ্গল
২৮। কথাসরিৎ সাগরের গল্প
২৯। এঁদের ভুলো না
৩০। রূপ-সনাতন
৩১। অন্নদামঙ্গল বিদ্যাসুন্দর
৩২। সন্ত তুলসীদাস
৩৩। ভক্ত রুইদাস
৩৪। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের গল্প
৩৫। সাধু তুকারাম
৩৬। তৈলঙ্গ স্বামী
৩৭। লোকসাহিত্যের গল্প
৩৮। মহাকবি বাল্মীকি
৩৯। ঠাকুর হরিদাস
৪০। রঘুবংশ

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ, কলিঃ-৯